DHRUBA CHAND HALDER COLLEGE

DEPT. OF HISTORY

STUDY MATERIAL FOR

2ND SEMESTER STUDENTS

SUBJECT – HISTORY (GENERAL)

PAPER- CC-2/GE-2

HISTORY OF INDIA (FROM C. 300 TO 1206 A.D.)

UPLOADED FOR D.C.H. COLLEGE STUDENTS

IN LOCKDOWN PERIOD

2ND SEMESTER TUTORIAL QUESTIONS FOR 2020

HISTORY GENERAL - CC-2/GE-2

"ক" বিভাগ

যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও **1 X 5 = 5**

1. আদি মধ্যযুগের অগ্রহার ব্যবস্থা
2. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়
3. শশাঙ্কের কৃতিত্ব আলোচনা কর।
4. চালুক্য রাজ দ্বিতীয় পুলকেশী
5. কৈবর্ত বিদ্রোহ
6. সেন আমলে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ আলোচনা কর।
7. আদি মধ্যযুগের গীল্ড গুলি কি ধরনের ভূমিকা পালন করত?
8. পল্লব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য
9. আরবদের সিন্ধু অভিযানের তাৎপর্য আলোচনা কর।
10. ভারত ইতিহাসে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের **(1192)** গুরুত্ব আলোচনা কর।

"খ" বিভাগ

যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও **1 X 10 = 10**

1. গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা কর।
2. সমুদ্র গুপ্তের কৃতিত্ব আলোচনা কর।
3. গুপ্ত যুগকে কি প্রাচীন ভারতের "সুবর্ণ যুগ" বলা যায়?
4. শাসক হিসেবে হর্ষবর্ধনের মূল্যায়ন কর।
5. ধর্মপাল ও দেবপালের অধীনে একটি আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে বাংলার বিকাশ আলোচনা কর।
6. আদি মধ্যযুগের পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে সংঘটিত ত্রিশক্তি দ্বন্দ্ব আলোচনা কর।
7. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বিশেষ উল্লেখসহ চোল প্রশাসনিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
8. চোলদের সামুদ্রিক কার্যকলাপ আলোচনা কর।
9. রাজপুত রাজ্যগুলির উত্থানের কারণ আলোচনা কর।
10. উত্তর ভারতে গজনীর সুলতান মামুদের আক্রমণের প্রকৃতি ও প্রভাব আলোচনা কর।

....

Tutorial Project জমা দেওয়ার তারিখ পরে জানানো হবে। জমা দেওয়ার সময় ছাত্রছাত্রীদের **1st Semester** এর **Admit** অথবা **Registration** আনতে হবে।

HISTORY - GENERAL
PAPER- CC-2/GE-2
FOR 2ND SEMESTER

* OBJECTIVE QUESTIONS:

OLD Question* C.U. - CBCS = 2019 - (For HONS. Candidates)

① গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
উত্তর: গুপ্ত বংশের প্রথম রাজা ছিলেন শ্রীগুপ্ত, তবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।

② এলাহাবাদ প্রশস্তি কে লিখেছিলেন?
এলাহাবাদ প্রশস্তি রচনা করেন সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেন।

③ গুপ্তযুগের দু'জন বিজ্ঞানীর নাম লেখ,
① আর্যভট্ট - (লিখিত গ্রন্থ - 'আর্যভট্টীয়')
② বরাহমিহির - (লিখিত গ্রন্থ - 'বৃহৎ-সংহিতা')

④ হর্ষবর্ধন কোন সালে সিংহাসনে বসেন
606 খ্রিষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন সিংহাসনে বসেন, 606 খ্রিষ্টাব্দ থেকে 'হর্ষ-সম্বত' গননা করা হয়।

⑤ শশাঙ্ক কে ছিলেন?
হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক গৌড়ের রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। তার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।

⑥ বানভট্ট কে ছিলেন?
হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন, তার বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'হর্ষচরিত'

⑦ কোন সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়:
গুপ্ত রাজবংশের আমলে পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তসম্রাট কুমারগুপ্ত, তথাগত গুপ্ত ও বালাদিত্যের প্রচেষ্টায় নালন্দায় বৌদ্ধবিহার গড়ে ওঠে, পরে হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আরো সমৃদ্ধ হয়।

⑧ কোথায় পল্লবদের রাজধানী ছিল?
পল্লবদের রাজধানী ছিল কাঞ্চী, এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন প্রথম নরসিংহবর্মন, তিনি বাতাপিকোন্ড উপাধি (নেন)

(9) আইহোল প্রশস্তির রচয়িতা কে?

আইহোল প্রশস্তির রচয়িতা চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সভাকবি রবিকীর্তি।

(10) কোন চোল রাজা 'গঙ্গাইকোণ্ড' উপাধি গ্রহণ করেন?

রাজেন্দ্র চোল বাংলাদেশ জয় করার পর 'গঙ্গাইকোণ্ড (গঙ্গাবিজেতা)' উপাধি গ্রহণ করেন।

(11) কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন?

পাল রাজা মহীপালের সময়ে কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়, এর নেতা ছিলেন দিব্যোক, পরে ভীম এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দে

(12) বাংলার প্রথম নির্বাচিত রাজা কে ছিলেন?

বাংলার প্রথম নির্বাচিত রাজা ছিলেন পালরাজা গোপাল, এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দেবপাল।

(13) অতীশ দীপঙ্কর কে ছিলেন?

অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন পাল যুগের বিখ্যাত দার্শনিক ও পণ্ডিত, তিনি বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি তিব্বতে যান এবং সেখানে দেহত্যাগ করেন।

(14) সুলতান মামুদ কে ছিলেন?

সুলতান মামুদ ছিলেন মধ্য এশিয়ার গজনীর অধিপতি, তিনি 1000 থেকে 1026 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সতেরোবার ভারত আক্রমণ করেন, গুজরাটের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন।

(15) কবে ও কাদের মধ্যে তরাইনের প্রথম যুদ্ধ হয়?

1191 সালে চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজের নেতৃত্বে উত্তর ভারতের রাজপুত রাজন্যবর্গের সঙ্গে মহম্মদ ঘোরীর মুসলমান বাহিনীর মধ্যে এই যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরী পরাজিত হন।

* * * * *

C. U. Question Paper: CBCS-2019 for General Studen

(16) গুপ্ত যুগের শ্রেষ্ঠ শাসকের নাম কি?
গুপ্ত যুগের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত, তিনি 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা' উপাধি গ্রহণ করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন,

(17) কোন সম্রাটের শাসনকালে ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে এসেছিলেন?
গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ফা-হিয়েন ভারতে আসেন, তাঁর লেখা গ্রন্থের নাম 'ফো-কুয়ো-কি',

(18) কে 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেন?
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতের শকশাসকদের পরাজিত করার পর 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেন, তাঁকে কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য বলে অনুমান করা হয়,

(19) হর্ষবর্ধনের সময় কোন চৈনিক পর্যটক ভারতে এসেছিলেন?
হিউয়েন সাঙ ভারতে আসেন, তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম 'সি-ইউ-কি',

(20) 'দায়ভাগ' ও 'মিতাক্ষরা' কাদের রচনা?
'দায়ভাগ' গ্রন্থের রচয়িতা জীমূতবাহন, এইগ্রন্থে মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, 'মিতাক্ষরা' গ্রন্থের রচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর, মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃত হয়নি, এই বইটি পালযুগে রচিত হয়,

(21) পল্লব শিল্পের একটি বিখ্যাত নিদর্শনের নাম কর
কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দির, মহাবলীপুরমের মুক্তেশ্বর মন্দির.

(22) নাসিক প্রশস্তি কার লেখা?
সাতবাহন যুগের শ্রেষ্ঠ রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী সম্পর্কে তাঁর মাতা গৌতমী বলশ্রী রচনা করেন,

23. 'ত্রিশক্তি যুদ্ধ' কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়?
কনৌজের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করাকে কেন্দ্র করে পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজবংশের মধ্যে ত্রিশক্তি যুদ্ধ হয়।

24. কত খ্রিস্টাব্দে আরবরা সিন্ধু অভিযান করে?
712 খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুদেশের রাজা দাহিরকে পরাজিত করেন।

25. কত খ্রিস্টাব্দে ভারতে দিল্লী সুলতানী সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হয়?
1206 সালে কুতুবউদ্দিন আইবক দাস বংশের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুলতানী সাম্রাজ্যের সূচনা করেন।

* * * * *

26. কালিদাসের লেখা তিনটি নাটকের নাম লেখ।
উঃ মেঘদূতম, রঘুবংশম, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

27. 'কিরাতার্জুনীয়ম' নাটকটি কার রচনা?
উঃ ভারবি।

28. কোন গুপ্তসম্রাট হূন আক্রমণ প্রতিহত করেন? কোন অভিলেখ এই তথ্য জানা যায়?
উঃ গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্ত হূন আক্রমণ প্রতিহত করেন। 'ভিটারী স্তম্ভলিপি' থেকে এই তথ্য জানা যায়।

29. 'গ্রহণ-মোক্ষ-অনুগ্রহ' নীতি কে, কেন গ্রহণ করেন?
সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি যুদ্ধে জয়ের পর পরাজিত রাজাদের আনুগত্য লাভ করে তাদের মিত্ররাজ্য হিসাবে পরাজিত রাজাদের রাজ্যগুলি ফিরিয়ে দেন। দূরবর্তী সরাসরি থেকে দাক্ষিণাত্যের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব নয় অনুভব করে তিনি এই পদক্ষেপ নেন।

30. হর্ষবর্ধন রচিত তিনটি গ্রন্থের নাম লেখ।
নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা।

(31) শীলভদ্র কে ছিলেন?
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

(32) পুষ্যভূতি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? এর রাজধানী কোথায় ছিল?
রাজা প্রভাকর বর্ধন, এর রাজধানী ছিল থানেশ্বর।

(33) 'শিলাদিত্য' উপাধি কে গ্রহণ করেন? তিনি কোন বংশের রাজা ছিলেন?
হর্ষবর্ধন 'শিলাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন, তিনি পুষ্যভূতি বংশের রাজা ছিলেন।

(34) হর্ষবর্ধনকে কেন 'সকলোত্তরপথনাথ' বলা হয়? তিনি কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন?
প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

(35) চর্যাপদ কোন যুগে রচিত হয়? পালযুগের দুজন রাজার নাম লেখো।
পালযুগে রচিত হয়, দুজন রাজার হলেন গোপাল ও ধীমান

(36) 'গীতগোবিন্দ' কে রচনা করেন? কোন রাজার সভাকবি ছিলেন?
গীতগোবিন্দের রচয়িতা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব, এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণিত হয়েছে।

(37) 'রামচরিত' গ্রন্থের রচয়িতা কে? এর বিষয়বস্তু উল্লেখ করো।
রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' রচনা করেন, এই গ্রন্থে কৈবর্ত বিদ্রোহের কাহিনী জানা যায়।

(38) 'তিরুক্কুরাল' কার রচনা? এতে কোন ধর্মের কথা বলা হয়েছে—
'তিরুক্কুরাল' একটি শ্রীহর্ষের রচনা, এতে মনীষীদের ভাবধারা তিরুর মতের কথা বলা হয়েছে

(39) বাংলায় কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক কে? এর লেখা দুটি গ্রন্থের নাম কর।
সেনবংশীয় রাজা বল্লাল সেন বাংলায় কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন, এর লেখা দুটি গ্রন্থ হল
① দানসাগর ② অদ্ভুতসাগর

(40) কার রচিত কোন প্রশস্তি থেকে বিজয়সেনের রাজত্বের কথা জানা যায়?
উমাপতি ধর রচিত — দেওপাড়া প্রশস্তি থেকে বিজয়সেনের রাজত্বের কথা জানা যায়।

(41) প্রাচীন বাংলার দুটি প্রধান বন্দরের নাম লেখ।
① সপ্তগ্রাম ② তাম্রলিপ্ত (বর্তমানে তমলুক)

(42) লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে কোন মুসলিম আক্রমণ ঘটেছিল এবং এর ফল কী হয়েছিল?
লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে কুতুবউদ্দিন আইবকের সেনাপতি ইখতিয়ার-উদ্দিন-মহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজী ১২০৪ খ্রিঃ নদীয়া আক্রমণ করেন, এরফলে বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের সূচনা হয়।

(43) 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত' ও 'পবনদূত' গ্রন্থের রচয়িতা কারা?
বিক্রমাঙ্কদেব চরিত — বিলহন
পবনদূত — ধোয়ী।

(44) সেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? এর নির্মিত বিখ্যাত মন্দির?
সেনবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বিজয়সেন, দেওপাড়ার প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির।

(45) 'মণ্ডলম' ও 'নাড়ু' শব্দের অর্থ কী?
চোল শাসনব্যবস্থায় দুটি প্রশাসনিক বিভাগ ছিল 'মণ্ডলম' (প্রদেশ) ও 'নাড়ু' (অঞ্চল), তাদের মধ্যে 'কুররম্'।

(46) 'চাচনামা' থেকে কি জানা যায়? অলবিরুনির লেখা গ্রন্থের নাম কি?
- চাচনামা থেকে আরবদের সিন্ধুবিজয়ের কাহিনী জানা যায়, অলবিরুনীর লেখা গ্রন্থের নাম 'তহকিক-উল-হিন্দ' বা 'কিতাব-উল-হিন্দ'।

(47) তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের (1192) গুরুত্ব কি?
1192 সালে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহান মহম্মদ ঘোরীর নিকট পরাজিত হন এবং ভারতে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন কায়েম হয়।

(48) কাকে 'হিন্দুস্থানের তোতাপাখি' বলা হয়? খিলজিদের সভাকবি কে ছিলেন?
কবি আমীর খসরুকে হিন্দুস্থানের তোতাপাখি বলা হয়, খিলজিদের সভাকবি ছিলেন সুলতানী যুগের জিয়াউদ্দিন বারানি, তাঁর লেখা গ্রন্থ হল- তারিখ-ই-ফিরোজশাহী।

(49) গজনীর সুলতান মামুদ কতবার ভারত আক্রমণ করেন? তিনি কি উপাধি গ্রহণ করেন?
সুলতান মামুদ 1000 থেকে 1027 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সতেরো বার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি বহু হিন্দু মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করে 'বুত-শিকন' বা মূর্তিভঙ্গকারী উপাধি গ্রহণ করেন।

(50) প্রথম সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? তিনি কি উপাধি নেন?
1206 সালে প্রথম সুলতানী সাম্রাজ্য বা দাসবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কুতুবউদ্দিন আইবক, তিনি 'মালিক উপাধি নেন', আর তিনি 'লাখবক্স' নামেও পরিচিত ছিলেন।

* * * * *

2nd SEM:
HIST- CC-2/GE-2

* টীকা লেখ: আদিমধ্যযুগের অগ্রহার ব্যবস্থা

আদিমধ্যযুগের ভারতীয় সমাজে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা, বি.এন.এস. যাদব, লাল্লনজী গোপাল, ডি.এন. ঝা সামন্ততন্ত্রের স্বপক্ষে মতামত দিয়েছেন, অন্যদিকে ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, হরবংশ মুখিয়া, দীনেশচন্দ্র সরকার, রণবীর চক্রবর্তী সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন, মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ডি.ডি. কোসাম্বী 'Feudalism from above' এবং 'Feudalism from below' - এই দুইভাবে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণকে জমিদান, পরবর্তীকালে হিন্দু মন্দির, জৈন মঠ ও বৌদ্ধবিহারগুলিতে ভূমিদানের ফলে অগ্রহার ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে।

মহাভারতে তিন প্রকার দানের উল্লেখ আছে ① হিরণ্য (সোনা) দান ② গো দান ③ ভূমিদান, এরমধ্যে ভূমিদান বা ভূমিদান শ্রেষ্ঠ, কারণ ভূমি থেকে আসে শস্য, অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে, অগ্রহার প্রাপক ব্রাহ্মণকে করদান থেকে অব্যাহতি দেওয়ার উল্লেখ আছে, পালি সাহিত্য থেকে জানা যায়, মগধের রাজা বিম্বিসার ও কোশলের প্রসেনজিৎ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন, মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত অথবা হর্ষবর্ধনের আমলে সরকারি কর্মচারীরা নগদ বেতনের পরিবর্তে সমতুল্য গ্রাম বা ভূখণ্ড পেতেন, সর্বপ্রথম প্রাচীন ভূমিদান সম্পর্কিত লেখ পাওয়া গেছে নানাঘাট ও নাসিক অঞ্চলে, ব্রাহ্মণদের যে ভূমিদান করা হত, তাকে বলা হত ব্রহ্মদান, দেবতা ও মন্দিরকে যে ভূমিদান করা হত, তাকে বলা হত দেবদান, স্কন্দগুপ্তের [illegible] তাম্রলিপি থেকে জানা যায়, তিনি বিষ্ণুমন্দিরকে একটি গ্রামদান করেন।

অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে এক মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়, কারণ অগ্রহার প্রাপক ব্রাহ্মণগণ কখনোই জমিতে শ্রমদান করতেন না, কারণ তা ছিল ব্রাহ্মণদের পক্ষে অসম্মানজনক, তাই ভূমিহীন

ক্রমশঃ [illegible] বিপুল [illegible] আভিজাত্য[illegible]
বা [illegible] ([illegible] নবজীবন নাগরিক)
জীবনের [illegible] হয়, সমাজের প্রকৃতি ([illegible]) স্বামী ([illegible]
মালিক) ও দাস ([illegible]) এই দুই সম্প্রদায়ে ভাগ হয়,
এই সামন্ততান্ত্রিক [illegible] অর্থনীতির [illegible]
[illegible] অবনতি হয়, [illegible]
[illegible] [illegible] অর্থনীতি [illegible]
হয়, যাকে ঐতিহাসিক [illegible]
'Urban Anaemia' ও 'Monetary Anaemia'
আখ্যা দিয়েছেন,
সমালোচক দীনেশচন্দ্র সরকার লিখেছেন,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
এই যুগে 'মধ্যবিত্ত' [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] সমাজের [illegible]
[illegible]
[illegible]
মত সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা [illegible]
ঐতিহাসিক [illegible]
[illegible] সমাজকে আধা সামন্ততান্ত্রিক (Semi
Feudal Society) সমাজ আখ্যা দিয়েছেন।

যুদ্ধবিগ্রহে অতিবাহিত করিয়াছে।

১.১৫. **নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ** হিউয়েনসাং ও ইৎসিং-এর বিবরণী এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষ হইতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা বর্তমান পাটনা জেলায় অবস্থিত ছিল। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবের চরম শিখরে উঠিয়াছিল। তদানীন্তন ভারতের ইহা ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। আধুনিক কালের অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ন্যায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ও সেই যুগে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করিয়াছিল।* খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে

প্রতিষ্ঠা

---

* বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন কেরল রাজ্যে বৈদিক ধর্মশাস্ত্রে শিক্ষা দেওয়ার জন্য দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহা ছাড়া তক্ষশীলা ও উজ্জয়িনীতেও দুইটি বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষাদানের জন্য তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়টি এক সময় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নালন্দার সন্নিকটে অবস্থিত বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয়টি এক সময় শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে হূনগণ কর্তৃক তক্ষশীলা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টি জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

গুপ্ত-সম্রাটগণ কর্তৃক বৌদ্ধ-সংঘ হিসাবে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নৃপতিগণ ও বিত্তশালীদের চেষ্টায় ও অর্থে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

নালন্দার বিভিন্ন শিক্ষায়তন

আটটি বিভিন্ন কলেজ বা শিক্ষায়তন লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়টি গঠিত ছিল। এইগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পৃষ্ঠপোষকগণ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে শ্রীবিজয় (সুমাত্রা) রাজ্যের রাজা বালপুত্রদেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলেজগুলি ছিল সারিবন্ধ। যশোধর্মদেবের অনুশাসনলিপিতে শিক্ষায়তনগুলির গঠনপ্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা রহিয়াছে। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

বিদেশী ছাত্র

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টি শুধু সুরম্য অট্টালিকার জন্যই প্রসিদ্ধ ছিল না। তথায় ছাত্রদের পঠন-পাঠনেরও সুবন্দোবস্ত ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি লাইব্রেরী বা পাঠাগার ছিল। এইগুলির নাম ছিল। (১) 'রত্নসাগর', (২) 'রত্নদধি' ও (৩) 'রত্নরঞ্জক'। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ইহাদের মধ্যে অনেকে বহিরাগত—যেমন মধ্য-এশিয়া, চীন, কোরিয়া, সিংহল, জাপান প্রভৃতি দেশের ছাত্রগণ। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতেও বহু ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। ইৎসিং-এর বিবরণীতে হুই-নিয়ে ও আর্যবর্মণ নামে দুইজন কোরিয় পণ্ডিতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে সহায়ক

শুধু যে বিদেশী ছাত্র ও পণ্ডিতগণই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করিতেন এমন নহে, এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও বহু ছাত্র ও পণ্ডিত বিশ্বের অন্যান্য স্থানে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্মবিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তিব্বতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগত পণ্ডিতদের মধ্যে সংরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, কমলশীল, বুদ্ধকীর্তি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পঠন-পাঠন

বস্তুত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রধান কেন্দ্র ছিল। বৌদ্ধদের নিকট ইহা ছিল পরম পবিত্র-ভূমি। অবশ্য কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের পঠন-পাঠন ছাড়াও বেদ, ব্যাকরণ, ন্যায়, আয়ুর্বেদ, গণিত ও বিবিধ ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিত। হিউয়েনসাং-এর সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন বাঙ্গালী পণ্ডিত শীলভদ্র। অধ্যক্ষ হিসাবে ধর্মপাল, জিনমিত্র, বসুবন্ধু, প্রভামিত্র, আর্যদেব প্রভৃতির নামও পাওয়া যায়।

শিক্ষা-স্বাধীনতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে দিবারাত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিত। তথায় শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। বিভিন্ন মতাবলম্বী ছাত্রগণ একত্রে অধ্যয়ন ও আলোচনার সুযোগ লাভ করিত। বিভিন্ন বিষয়ের বিতর্ক-আলোচনা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। হিউয়েন সাং বহুবার এইরূপ বিভিন্ন বিষয়ের বিতর্ক আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাত্র স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণই ভর্তি হইবার সুযোগ পাইত। পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র গ্রহণ করা হইত এবং এইরূপ পরীক্ষার মান ছিল উচ্চ। হিউয়েনসাং-এর কথায় "বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই দেশ-দেশান্তর হইতে পণ্ডিতগণ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করিতেন"। সুতরাং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান যে খুবই উচ্চ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

শিক্ষার উচ্চ মান

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহের জন্য উহার নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। প্রায় ১৮০টি গ্রামের আয় হইতে নালন্দার ব্যয় নির্বাহ হইত।

নালন্দার আয়

ইৎ-সিং-এর ভারতভ্রমণের পরও প্রায় পাঁচ শতাব্দী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব বজায় ছিল। ইহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৌদ্ধধর্মেরও অবক্ষয় ঘটে।

নালন্দার অবক্ষয়

...রাজত্বের অবসান ঘটে।

(৯) বাংলাদেশ ঃ গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক (Bengal : Sasanka of Gauda) ঃ

প্রাচীনকালে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। গুপ্ত যুগের পূর্বে বাংলার কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয় নি। অনেকের মতে গুপ্তদের আদি বাসস্থান ছিল বাংলাদেশ। এই মত সত্য হলে শুরু থেকেই বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তা না হলে *'এলাহাবাদ প্রশস্তি'* অনুসারে সমতট (পূর্ববঙ্গ) বাদে সমগ্র বাংলা সমুদ্রগুপ্ত জয় করেন।

...সূচনা

■ **গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক ঃ** ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কালে বাংলাদেশে একাধিক স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি ঘটে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমভাগে এইসব রাজ্যগুলির মধ্যে গৌড় রাজ্য সর্বাধিক খ্যাতি ও প্রভাব অর্জন করে। গৌড় রাজ্যের এই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের (৬০৬-৬৩৭ খ্রিঃ) বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।

গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক সম্পর্কে কোনও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তথ্যের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় শশাঙ্কের বিরুদ্ধবাদী ঐতিহাসিকদের উপর। হর্ষের সভাকবি ***বাণভট্ট*** ও চৈনিক পরিব্রাজক ***হিউয়েন সাঙ্‌***-এর রচনা এবং বৌদ্ধগ্রন্থ *'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প'*-ই হল তথ্যের উৎস। বাণভট্ট বা হিউয়েন সাঙ্‌ পরিবেশিত তথ্য পক্ষপাতদুষ্ট। বাণভট্ট ছিলেন হর্ষের আশ্রিত, আর হিউয়েন সাঙ্‌ হর্ষের দ্বারা উপকৃত। শশাঙ্কের কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে, যা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিকদের সাহায্য করবে।

উপাদান

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার-এর মতে, ''বাঙালি রাজগণের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নরপতি।'' তাঁর প্রথম জীবন বা তাঁর বংশপরিচয় সম্পর্কে কোনও তথ্য জানা যায় না। অনেকের মতে তিনি গুপ্তবংশসম্ভূত ছিলেন এবং তাঁর অপর নাম ছিল **নরেন্দ্রগুপ্ত**। এই মত ঐতিহাসিক মহলে স্বীকৃত নয়। আবার অনেকে অনুমান করেন যে, তিনি *'পরবর্তী-গুপ্তবংশীয়'* মগধ-রাজ মহাসেনগুপ্তের অধীনে সামন্ত ছিলেন। মহাসেনগুপ্তের মৃত্যুর পর ৬০৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই তিনি গৌড়ে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই যুগে গৌড় বলতে উত্তর বাংলা ও পশ্চিম বাংলাকে বোঝাত। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।

আদি পরিচয়

গৌড়ের স্বাধীন নৃপতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পরেই তিনি রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হন। দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ তাঁর অধিকারে ছিল কিনা সঠিকভাবে তা বলা দুরূহ—

তবে বাংলার বাইরে অভিযান পাঠাবার পূর্বে নিশ্চয়ই সমগ্র বাংলার উপর তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুরের দাঁতন), উৎকল (বালেশ্বর অঞ্চল) ও কঙ্গোদ (উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা) জয় করেন। পশ্চিমে মগধও তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ***ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার*** বলেন, "শশাঙ্কের পূর্বে আর কোনও বাঙালি রাজা এইরূপ বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই।"

রাজ্যজয়

সমগ্র বাংলা ও বিহার এবং উড়িষ্যার কিছু অংশ জয় করার পর শশাঙ্ক গৌড়ের শত্রু কনৌজের মৌখরি-বংশীয় রাজা **গ্রহবর্মন**-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। 'পরবর্তী-গুপ্ত'-দের আমল থেকে কনৌজের মৌখরিরা বারংবার বাংলার উপর আক্রমণ হানে। 'পরবর্তী-গুপ্ত'-দের উত্তরাধিকারী হিসেবে শশাঙ্ক-ও এই বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। গ্রহবর্মন থানেশ্বরের পুষ্যভূতি-বংশীয় রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা **রাজ্যশ্রী**-কে বিবাহ করেন। মৌখরি ও পুষ্যভূতি বংশের মধ্যে এই বৈবাহিক সম্পর্ক বা শক্তিজোট মালব-রাজ **দেবগুপ্ত**-র পক্ষে অস্বস্তিকর ছিল, কারণ পুষ্যভূতিদের সঙ্গে মালব রাজবংশের শত্রুতা ছিল। এই কারণে দেবগুপ্ত শশাঙ্কের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন। এইভাবে একটি পাল্টা শক্তিজোট গড়ে ওঠে।

মৈত্রী-জোট

দেবগুপ্ত ও শশাঙ্ক যৌথভাবে কনৌজ আক্রমণ করেন। গ্রহবর্মন পরাজিত ও নিহত হন (৬০৬ খ্রিঃ) এবং রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করা হয়। থানেশ্বর-রাজ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর (৬০৫ খ্রিঃ) পর থানেশ্বরের তরুণ নৃপতি **রাজ্যবর্ধন** তখন দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে দেবগুপ্ত পরাজিত ও নিহত হন, কিন্তু বিপরীত দিকে রাজ্যবর্ধন আবার শশাঙ্কের হাতে নিহত হন। ***বাণভট্ট*** ও ***হিউয়েন সাঙ্*** বলেন যে, শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন। ডঃ ***রমেশচন্দ্র মজুমদার***-এর মতে, শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে ন্যায়-যুদ্ধে পরাজিত করেন। এ ছাড়াও তিনি বলেন যে, বাণভট্ট ও হিউয়েন সাঙ্-এর বিবরণে নানা অসঙ্গতি আছে। ডঃ ***রাধাগোবিন্দ বসাক*** (R. G. Basak), ***ডঃ ডি. সি. গাঙ্গুলী*** (D. C. Ganguly) এবং ***অধ্যাপিকা দেবাহুতি*** (D. Devahuti) অবশ্য শশাঙ্কের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। তবে সমকালীন রাজনৈতিক মানসিকতার প্রেক্ষাপটে শশাঙ্কের কাজ বিশ্বাসঘাতকতামূলক হলেও অনৈতিক ছিল না। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুতে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা **হর্ষবর্ধন** থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন (৬০৬ খ্রিঃ) এবং শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। শশাঙ্কের শক্তিবৃদ্ধিতে কামরূপ-রাজ **ভাস্করবর্মন** ভীত হয়ে হর্ষের সঙ্গে যোগ দেন। বৌদ্ধগ্রন্থ ***'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প'***-তে বলা হচ্ছে যে, হর্ষ শশাঙ্ককে পরাজিত করেন। এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। শশাঙ্ক ও হর্ষের মধ্যে কোনও যুদ্ধ সম্পর্কে বাণভট্ট ও হিউয়েন সাঙ্ সম্পূর্ণ নীরব। এছাড়া ***'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প'*** একটি বৌদ্ধগ্রন্থ এবং তা অনেক পরবর্তীকালের রচনা। বলা বাহুল্য, হর্ষ ও ভাস্করবর্মনের মিলিত শক্তিজোট শশাঙ্কের কোনও ক্ষতি করতে পারে নি এবং ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি গৌড়, মগধ, দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও কঙ্গোদের অধিপতি ছিলেন।

শশাঙ্ক বনাম হর্ষ

শশাঙ্ক শিবের উপাসক ছিলেন। বাণভট্ট, হিউয়েন সাঙ্ ও বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে তাঁর

বৌদ্ধধর্ম-বিদ্বেষী বলে অভিহিত করা হয়েছে। ***বাণভট্ট*** শশাঙ্ককে *'গৌড়াধম'* ও *'গৌড়ভুজঙ্গ'* বলে অভিহিত করেছেন। ***হিউয়েন সাঙ্*** বলেন যে, শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার পবিত্র বোধিবৃক্ষ ছেদন করেন এবং বৃক্ষের শিকড় উৎপাটন করেন। তিনি পাটলিপুত্রে বুদ্ধের

ধর্মমত

চরণচিহ্ন অঙ্কিত প্রস্তরখণ্ড বিনষ্ট করেন এবং কুশীনগর বিহার থেকে বৌদ্ধদের বিতাড়িত করেন। তাঁর মতে এইসব অত্যাচারের পাপেই নাকি শশাঙ্ক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ***ডঃ নীহাররঞ্জন রায়*** ও ***রাধাগোবিন্দ বসাক*** শশাঙ্ক-বিরোধীদের সঙ্গে সহমত পোষণ করলেও ***ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার*** ও ***ডঃ রমাপ্রসাদ চন্দ্র*** উপরোক্ত মতামতগুলি গ্রহণ করতে রাজি নন। তাঁদের মতে হর্ষের অনুগত হিউয়েন সাঙ্ ও বাণভট্ট শশাঙ্ক-বিদ্বেষী ছিলেন। হিউয়েন সাঙের রচনা থেকে জানা যায় যে, শশাঙ্কের রাজত্বকালে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল, রাজধানী কর্ণসুবর্ণে তাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং তিনি নিজেই তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি স্থানে বহু বৌদ্ধ স্তূপ দেখেছিলেন।

বাংলার ইতিহাসে **শশাঙ্ক** একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সর্বভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে তিনিই প্রথম বাংলাকে এক বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাঙালি রাজনীতিবিদদের মধ্যে তিনিই প্রথম আর্যাবর্তে বাঙালির সাম্রাজ্য

কৃতিত্ব

প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন এবং তা আংশিকভাবে কার্যে পরিণত করেন। সুচতুর কূটকৌশলী শশাঙ্ক প্রবল শক্তিশালী হর্ষবর্ধনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় আধিপত্য বজায় রাখেন। তাঁর রাজ্যজয় দ্বারা তিনি যে নীতির পত্তন করেন, তা অনুসরণ করে পরবর্তীকালে পালরাজারা এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।[১] ***ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার*** বলেন যে, ''বাণভট্টের মতো চরিত-লেখক অথবা হিউয়েন সাঙ্-এর মতো সুহৃদ থাকিলে হয়তো হর্ষবর্ধনের মতোই তাঁহার খ্যাতিও চতুর্দিকে বিস্তৃত হইত। কিন্তু অদৃষ্টের নিদারুণ বিড়ম্বনায় তিনি স্বদেশে অখ্যাত ও অজ্ঞাত এবং শত্রুর কলঙ্ক-কালিমাই তাঁহাকে জগতে পরিচিত করিয়াছে।''[২]

❖ প্রশ্ন (৩) : *টীকা লেখ : দ্বিতীয় পুলকেশী।*

■ **উত্তর :** বাতাপির চালুক্যবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী মোট বত্রিশ বছর (৬১০ ৬৪২ খ্রীঃ) রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানতে রবিকীর্তির "**আইহোল প্রশস্তি** (৬৩৬) হিউয়েন সাঙ-এর "**সি-ইউ-কি**" ও বাণভট্টের '**হর্ষচরিত**" প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য

৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পুলকেশীর পিতা প্রথম কীর্তিবর্মনের মৃত্যুর পর তাঁর পিতার বৈমাত্রেয় ভাই **মঙ্গলেশ** তাঁর সিংহাসনের বৈধ দাবি অস্বীকার করে সিংহাসন দখলের অনেক চেষ্টা করলেও শেষে তাঁকে হত্যা করে ৬১০ খ্রীঃ সিংহাসন লাভ করেন। এইসময় বিজাপুরের রাজা **গোবিন্দ** ও **আপ্পায়িককে** পরাস্ত করে তিনি সামরিক প্রতিভার পরিচয় দেন। 'আইহোল প্রশস্তি' থেকে জানা যায়, দ্বিতীয় পুলকেশী **কদম্বরাজাদের রাজধানী বানভাসী জয় করেন।** মহীশূরের গঙ্গরাজ **দুর্বিনীত কোঙ্গনী** তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। **কোঙ্কনের মৌর্যরাজার রাজধানী পুরী তাঁর দখলে আসে। উত্তরে লাট, মালব, গুর্জর ও গুজরাট তিনি জয় করেন। কাঞ্চীর রাজা প্রথম মহেন্দ্রবর্মনকে তিনি পরাস্ত ও নিহত করেন।**

রাজ্যজয়

৬১১ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধন পুলকেশীর কাছে পরাজিত হন। এই ঘটনাকে স্মরণীয় রাখতে দ্বিতীয় পুলকেশী **"দক্ষিণাপথনাথ"** ও **"পরমেশ্বর"** উপাধি নেন। তিনি বিষ্ণুকুন্দিন রাজবংশের **তৃতীয় বিক্রমেন্দ্র-বর্মনকে** পরাজিত করে অন্ধ্র জয় করেছিলেন। গোদাবরীর তীরবর্তী **পীঠরাম** ও ইল্লোরের পার্শ্ববর্তী কুনালদ্বীপ তিনি জয় করে ছোটভাই কুব্জকে ঐ অঞ্চলের **শাসক** নিযুক্ত করেন। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে **"মনিমণ্ডলমের যুদ্ধে"** পল্লবরাজ প্রথম নর-সিংহবর্মনের কাছে পুলকেশী পরাস্ত ও নিহত হন। এই নরসিংহবর্মন **"বাতাপিকোণ্ডা"** উপাধি নিয়েছিলেন।

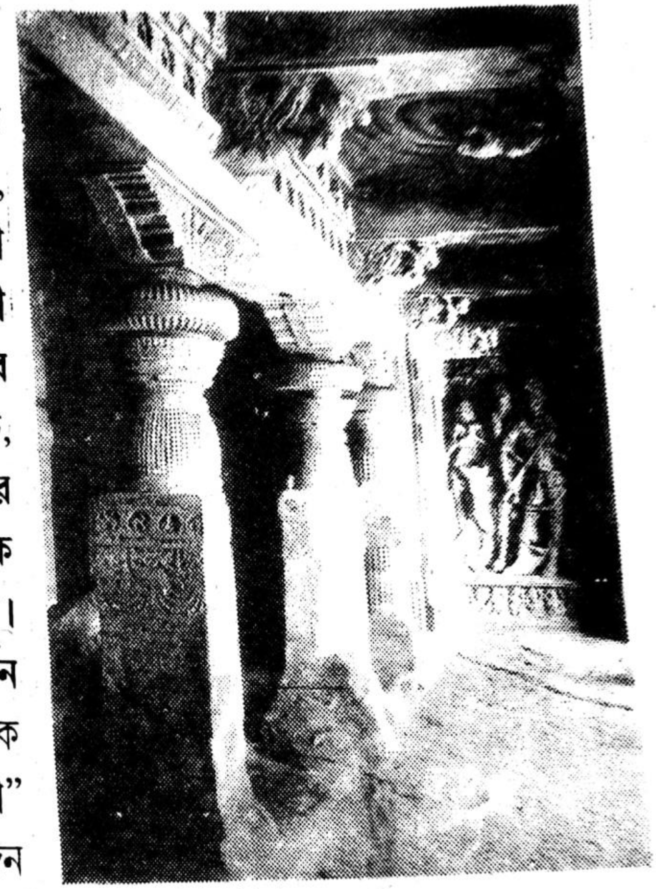

বাদামীর পাহাড়কাটা মন্দির

নিরবচ্ছিন্ন সামরিক সাফল্যের জন্য পুলকেশী **"বিরুদ সত্যাশ্রয়"**, **"শ্রীপৃথ্বিবল্লভ"**, **"বল্লভেন্দ্র"**, **"বল্লভরাজ"**, **"বল্লভ"** প্রভৃতি উপাধি নেন। ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে নাসিকের **গোহন শিলালিপিতে** বিষ্ণু উপাসনার জন্য **"পরমেশ্বর পরম ভাগবত"** উপাধি নিয়েছিলেন।

হিউয়েন-সাঙ ৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজধানী বাতাপি পরিভ্রমণে এসে তাঁর উদারতা, সুশাসন, বীরত্ব ও ধৈর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মুসলিম ঐতিহাসিক **আলতাবরির** মতে পুলকেশী পারস্যের রাজা দ্বিতীয় খসরুর দরবারে ৬২৩-৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে দূত পাঠিয়েছিলেন। পুলকেশীর মৃত্যুর পর চালুক্যদের গৌরব ম্লান হয়ে যায়।

কৈর্বত বিদ্রোহ : পালরাজা দ্বিতীয় মহীপালের শাসনকালে দিব্য বা দিব্যো নেতৃত্বে বরেন্দ্রভূমিতে কৈবর্ত বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত *'রামচরিত'* এই বিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটি ছাড়া কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেবের *'কামাউলি পট্ট'*, মদনপালের *'মানাহালি দানপত্র'* এবং পূর্ববঙ্গের ভোজবর্মনের *'বেলা দানপত্রে'* এই ঘটনার বিবরণ আছে।

কারণ

এই বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে পণ্ডিতরা একমত নন। (১) **ডঃ *এস. পি. লাহিড়ি*** বলে যে, কৈবর্ত সম্প্রদায়ভুক্ত 'যশোদাস' নামক জনৈক ব্যক্তি পালরাজা রাজ্যপালের মন্ত্রী নিযু হন এবং এই সময় থেকেই কৈবর্তদের রাজনৈতিক উত্থান শুরু হ এই বিদ্রোহের মাধ্যমে তারা তাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠ উদ্যোগী হয়। (২) **ডঃ *বিনয়চন্দ্র সেন*** বলেন যে, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালরাজাদের স মৎস্যজীবী কৈবর্তরা নানা ধরনের সামাজিক অসুবিধা ভোগ করত। পালরাজারা এই ম একটি নির্দেশ জারি করেন যে, মৎস্যঘাতীরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে পারবে না। এ উত্তরবঙ্গের মৎস্যজীবী সম্প্রদায় কৈবর্তরা ক্ষুব্ধ হয় এবং মহীপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষ করে। **ডঃ *আবদুল মোমিন চৌধুরী*** এই মতের বিরোধিতা করে বলেন যে, পালরাজাদে আমলে কৈবর্তরা বিশেষভাবে নির্যাতিত হয়েছিল তা বলা যায় না। ধর্মবিষয়ে পালরাজা উদার ছিলেন। এছাড়া, এ সময় বৌদ্ধধর্ম এত বেশি পরিবর্তিত হয়েছিল এবং হিন্দু ধর্মে এত উপাদান গ্রহণ করেছিল যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে পার্থক্য করাই দুরূহ ছি (৩) ঐতিহাসিক ***অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়*** বলেন যে, সিংহাসনের অধিকারী হিসেবে রামপা ছিলেন 'সর্বসম্মত', কিন্তু বয়সের জোরে মহীপাল সিংহাসন দখল করায় এই বিদ্রো সংঘটিত হয়। **ডঃ *আবদুল মোমিন চৌধুরী*** বলেন যে, বিদ্রোহ সফল হওয়ার পর রামপা রাজ্যের কেন্দ্রস্থল থেকে বিতাড়িত হন। এছাড়া *'রামচরিত'*-এ বলা হয়েছে যে, এই বিদ্রো রামপালের বিশেষ মনঃপীড়ার কারণ হয়। সুতরাং এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, রামপালে অনুকূলে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয় নি। (৪) **ডঃ *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী***-র মতে কৈবর্তরা ছি উত্তরবঙ্গের একটি শক্তিশালী ও যুদ্ধপ্রিয় সম্প্রদায়। মহীপালের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে তারা দিব্য-র নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। **ডঃ *ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত*** বলেন যে, "রাজশ এমন কিছু অন্যায় বা অত্যাচার করিতেছিল যাহার বিরুদ্ধে অভিজাত সম্প্রদায় এবং প্রজা বিদ্রোহী হইয়াছিল।"[১] **ডঃ *রমেশচন্দ্র মজুমদার***-এর মতে "বস্তুত মহীপাল যে প্রজাপী বা অত্যাচারী রাজা ছিলেন এবং এজন্যই তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইয়াছিল এরূপ ম করিবার কোনও কারণ নাই।"[২] তাঁর মতে, সম্প্রদায় হিসেবে কৈবর্তরা বিদ্রোহে যোগ দে নি বা মহীপালের কুশাসনের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্যও দিব্য এই বিদ্রোহে অ নেন নি। বস্তুত এই বিদ্রোহ ছিল অন্যান্য বিদ্রোহের মতো দুর্বল রাজকীয় কর্তৃত্বের বিরু সামন্তদের ক্ষমতা দখলের উদ্যোগ। (৫) **ডঃ *উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, স্যার যদুনাথ স*** প্রমুখ এই বিদ্রোহের পশ্চাতে গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ দেখেছেন। তাঁ

১ ***ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি***

মতে, কৈবর্ত সম্প্রদায়ভুক্ত দিব্য এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিলেও এটি নিছক কৈবর্ত বিদ্রোহ ছিল না। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে দিব্য এই বিদ্রোহ শুরু করেন। ***ডঃ মজুমদারের*** মতে দিব্যর ব্যক্তিগত উচ্চাশা এই বিদ্রোহে ইন্ধন জোগায় এবং রাজতন্ত্রের দুর্বলতা একে সাহায্য করে।

'রামচরিত' গ্রন্থে বলা হচ্ছে যে, (১) রাজকীয় বাহিনী *'মিলিতান্তক সামন্তচক্রে'*-র সম্মুখীন হয়েছিল, অর্থাৎ রাজকীয় বাহিনী সামন্তদের সম্মিলিত বাহিনীর সম্মুখীন হয়।

প্রকৃতি

(২) এই গ্রন্থে কৈবর্ত নায়ক দিব্যকে *'দস্যু'* এবং *'উপাধিব্রতী'* বলা হয়েছে। *'দস্যু'* কথার অর্থ হল 'দুষ্টব্যক্তি', আর *'উপাধিব্রতী'* কথার অর্থ হল 'যিনি কর্তব্যপালনের ছদ্মবেশে উচ্চাকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ করেন'। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, মহীপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হলে পালরাজাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী দিব্য এই বিদ্রোহ দমনের ভান করে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন এবং মহীপালকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। (৩) *'রামচরিত'*-এ এই বিদ্রোহকে *'অনিকম ধর্মবিপ্লব'* বলা হয়েছে। *'অনিকম'* কথার অর্থ অপবিত্র। 'ধর্ম' অর্থ যদি ন্যায়-নীতি ও কর্তব্য বোঝায়, তাহলে অবশ্যই দিব্য ন্যায়-নীতি ও কর্তব্যবোধ লঙ্ঘন করেছিলেন। এই বিদ্রোহের ফলাফল বা তাৎপর্য খুব বেশি ছিল না। দিব্য-র নেতৃত্বাধীন সামন্ততন্ত্র খুব বেশিদিন মিলিত ছিল না, কারণ সামন্তদের একাংশের সাহায্য নিয়েই পালরাজা রামপাল সিংহাসন দখল করেন।

বিদ্রোহে জয়যুক্ত হয়ে দিব্য বরেন্দ্রীতে তাঁর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা **রুদ্রোক**, এবং রুদ্রোকের পুত্র **ভীম** সিংহাসনে বসেন। ভীমের একটি

কৈবর্ত শাসনের অবসান

সুসংগঠিত অশ্বারোহী ও হস্তিবাহিনী ছিল। *'রামচরিত'*-এ ভীম সম্পর্কে কিছু প্রশংসাসূচক কথা আছে। দিনাজপুরের 'কৈবর্তস্তম্ভ' আজও কৈবর্ত শাসনের চিহ্ন বহন করছে। ভীমের শাসনকালেই সামন্তদের একাংশ ও অন্যান্যদের সাহায্য নিয়ে রামপাল বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধার করেন।

❖ **প্রশ্ন (২) :** [redacted] *সেন যুগে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন।* [redacted] ([redacted]), [redacted]]
অথবা, খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলার সাংস্কৃতিক অগ্রগতি বর্ণনা কর।

■ **উত্তর :** প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক জাগরণে পাল ও সেন যুগে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের ভারতের ইতিহাসে এই সাংস্কৃতিক উন্নতির প্রভাব পড়েছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক বিবর্তনের পথ ধরে বাংলার সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করেছিল। সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক অর্থাৎ **ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, চিত্রকলা, শিল্পকলা, শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছিল** এই সময়।

সূচনা

● **ধর্ম : পাল রাজারা ছিলেন বুদ্ধের উপাসক এবং সেন রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপাসক।** খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতকে বৌদ্ধধর্মে পরিবর্তন আসে। এই সময় ধর্মে তন্ত্র-মন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটায় **ব্রজযান, সহজযান, তন্ত্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি মতবাদের উদ্ভব ঘটে। আবার বৌদ্ধ ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মিলনে 'অবধূতমার্গ' ও 'বাউলমার্গে'র উদ্ভব ঘটে।** তাই **বৌদ্ধ বাউল বা সহজিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাব** বাড়ে। বৌদ্ধ দেবতা তারা ও **হিন্দু দেবদেবী শিব,** কালী, দুর্গা, **সরস্বতী** প্রভৃতির ব্যাপক পূজা প্রচলন শুরু হয়। **বৌদ্ধ মঠের পাশাপাশি হিন্দু মন্দিরের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তে শুরু করে।**

ধর্মে বিবর্তন

● **শিক্ষা ঃ** পাল যুগের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় হল **নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়।** ইহা এশিয়ার অন্যতম প্রধান বৌদ্ধধর্ম চর্চার কেন্দ্ররূপে গণ্য হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভরণপোষণের সব দায়িত্ব নিয়েছিলেন পালরাজারা। পালরাজাদের উদ্যোগে **ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা, সোমপুরী, দেবীকোট, জগদ্দল,** প্রভৃতি মহাবিহারগুলি অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। পণ্ডিত শীলরক্ষিত যখন ওদন্তপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এখানকার ছাত্র ছিলেন। ধর্মপাল বিহারের ভাগলপুরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করেছিলেন, যার নাম বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়। এই মহাবিহারের অধীনে ছিল ১০৭ টি মঠ, ৬ টি মহাবিদ্যালয়। এখানে ১১৪ জন অধ্যাপক ও ৩০০০ শিক্ষার্থী ছিলেন। প্রধান আচার্য ছিলেন শ্রী**অভয়াকর গুপ্ত**। এখানে পড়ানো হত বৌদ্ধদর্শন, ন্যায়দর্শন, ব্যাকরণ, চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র। বিশিষ্ট অধ্যাপকদের মধ্যে **দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, রত্নাকর শান্তি, শ্রীধর, বুদ্ধজ্ঞানপাদ, কল্যাণরক্ষিত,** প্রমুখ প্রধান। প্রায় ৪০০ বছর এখানে সগৌরবে শিক্ষাচর্চা চলেছিল। সোমপুরী বিশ্ববিদ্যালয়টির যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। ধর্মপাল ৫০টি ধর্ম-বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ্ ও কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্র মনে করেন, বাঙালীরা শিক্ষাদীক্ষার প্রতি উৎসাহী ছিলেন।

বিক্রমশীলা মহাবিহার

● **ভাষার উন্নতি ঃ** এই যুগে **সংস্কৃত, প্রাকৃত ও সৌরসেনী অপভ্রংশ ছিল সাহিত্যের প্রধান তিনটি ভাষা। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা মাগধী অপভ্রংশ বাংলা ভাষার উৎপত্তির ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। অপভ্রংশ ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি হলেন স্বয়ম্ভু।** পাল যুগের **বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা চর্যাপদগুলি খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে রচনা করেন। চাউপাউ ছন্দের এই পদগুলি** রচনা করেন **লুইপাদ, ভুমকপাদ, শান্তিপাদ, শবরপাদ, অরহপাদ, কাহ্নপাদ প্রমুখ বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যরা।** ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাপদগুলি "হাজার বছরের পুরাণ বাংলাভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামে প্রকাশ করেন। এরই অন্তর্গত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর একটি উদ্ধৃতাংশ হল **"কাহেরে ঘিনি মেলি আছহু কীস। বেঢ়িল পড়া চৌদিসা॥ অপণা মাংসে হরিণা বৈরী।** ....." অর্থাৎ **কাকে গ্রহণ করি, কাকেই বা ত্যাগ করি? চারদিক বেড়ে হাঁক পড়ল। হরিণের শত্রু তার নিজের মাংস।**

চর্যাপদের উৎপত্তি

● **সাহিত্যের উন্নতি ঃ** এই যুগে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগের সূচনা হয়েছিল। পণ্ডিত চতুর্ভুজের লেখা **'হরিচরিত'** গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বরেন্দ্রভূমির ব্রাহ্মণরা পুরাণ ও ব্যাকরণে যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। এই যুগের অন্য পণ্ডিতদের মধ্যে ভবদেব ভট্টের **'হেরাশাস্ত্র'**, সন্ধ্যাকর নন্দীর **'রামচরিত'** (শ্লেষকাব্য), জীমূতবাহনের **'দায়ভাগ'** (হিন্দু আইন গ্রন্থ), অভিনন্দের **'কাদম্বরী কথাসাগর'**, শ্রধর ভট্টের **'ন্যায়কন্দলী'**, বিশাখদত্তের **'মুদ্রারাক্ষস'** (৮০০ খ্রীঃ), সপ্তম শতকে ভট্টির **'রাবণবধ'** (ভট্টিকাব্য), একাদশ শতকে পদ্মগুপ্তের **'নরসাহসাঙ্কচরিত'** (মালব রাজার জীবনী), দ্বাদশ শতকের শ্রীহর্ষের **'নৈকর্ষচরিত'**। এছাড়া ভর্তৃহরির কবিতাগ্রন্থ, ভবভূতির **'উত্তররাম-চরিত'** ও **'মালতি-মাধব'**, দশম শতকে রাজশেখরের **'কর্পূর-মঞ্জরী'** ও **'বাল রামায়ণ'** প্রভৃতি। **ধোয়ীর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্মণ সেন তাঁকে "কবিরাজ চক্রবর্তী" উপাধি দেন। পাল যুগের পণ্ডিতদের মধ্যে মৈত্রেয় রক্ষিত, জিনেন্দ্রবুদ্ধি, সর্বানন্দ প্রমুখ।** প্রসঙ্গত উল্লেখ্য **'তান্ত্রিক'** গ্রন্থের লেখ **প্রজ্ঞাবর্মন** ও **'বজ্রযান সাধন'** গ্রন্থের লেখক **অতীশ দীপঙ্করের** নাম উল্লেখ্য। **অতীশ দীপঙ্কর তের বছর তিব্বতে থেকে ২০০টি বৌদ্ধ গ্রন্থ লিখেছিলেন।** সেনযুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে হলায়ুধের **'মীমাংসা-সর্বস্ব'** ও **'ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব'** গ্রন্থ উল্লেখ্য। বল্লালসেনের **'ব্রতসাগর', 'প্রতিষ্ঠাসাগর'** ও **'আচার্যসাগর', 'দানসাগর'** ও **'অদ্ভুতসাগর'**, অনিরুদ্ধ ভট্টের

পালযুগের সাহিত্য

সেনযুগের সাহিত্য

'হরিলতা' ও **'পিতৃদয়িতা'**, ধোয়ীর **'পবনদূত'**, উমাপতি ধরের **'চন্দ্রচূড়-চরিত'**, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের শেষ যে লাইনটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং লিখেছিলেন তা হল "স্মরগরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং' 'দেহি পদপল্লব মুদারং।' **'গীতাগোবিন্দ'**, সর্বানন্দের **'টীকাসর্বস্ব'**, গোবর্ধনাচার্য-এর **"আর্যাসপ্তশতী"** ও শ্রীধর দাসের **"সংস্কৃত-কোষ"** গ্রন্থ **'সদুক্তি কর্ণামৃত'** প্রভৃতি কালজয়ী রচনা ছিল।

● **চিকিৎসাশাস্ত্র :** চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে মাধবকারের **'মাধবনিদান'**, বৃন্দের **'সিদ্ধযোগ'**, চক্রপাণি দত্তের **'আয়ুর্বেদ দীপিকা'**, **'ভানুমতী'**, **'শব্দচন্দ্রিকা'**, **'চিকিৎসাসংগ্রহ'**, শূরপাল ও বঙ্গসেনের **'শারীরবিদ্যা'** ও **চিকিৎসাশাস্ত্র গ্রন্থ** এবং সুরেশ্বরের **'শব্দপ্রদীপ'**, **'বৃক্ষায়ুর্বেদ'** ও **'লৌহ পদ্ধতি'** চিকিৎসাশাস্ত্রের অমূল্য রচনা। **বাগভট্ট, ভাস্করাচার্য** (জন্ম ১১১৪ খ্রীঃ), **দ্বিতীয় আর্যাভট্ট, কল্যাণ বর্মণ, শ্রীধর, মহাবীর, বলভদ্র** প্রমুখ গণিত ও জ্যোতিষের উপর বহু গ্রন্থ লিখে জ্ঞানপিপাসুদের কাছে খ্যাতি পেয়েছেন।

● **শিল্প-স্থাপত্য :** বাংলার সোমপুর, পাহাড়পুর, ওদন্তপুর, বিক্রমশীলা প্রভৃতি মহাবিহারের স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্প শিল্প-স্থাপত্যের অন্যান্য দৃষ্টান্ত। বিভিন্ন বিহার ও মন্দির

সর্বতোভদ্র শিল্পনীতি

নির্মাণকৌশল তিব্বত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুবর্ণভূমির শিল্পপ্রেমীরা অনুকরণ করে। বাস্তুশিল্পে **"সর্বতোভদ্র"** নামে একপ্রকার মন্দিরনির্মাণ রীতির উল্লেখ আছে। **ডঃ নীহাররঞ্জন রায়** বলেন, **"পাহাড়পুরের মন্দির প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠ বিস্ময়। সকল সবতোভদ্র মন্দিরের পুরোভোগে এর অবস্থান দেখা যায়।"** স্থাপত্যের জগতে ইহা উল্লেখ্য।

পালযুগের 'টেরাকোটা শিল্প' (বা পোড়ামাটির মূর্তি ও সূক্ষ্ম কারুকার্যময় শিল্প) স্থাপত্য শিল্পের মৌলিক প্রতিভার পরিচয় বহন করে। বিখ্যাত দুই স্থাপত্যশিল্পী ছিলেন **ধীমান** ও তাঁর

টেরাকোটা শিল্পরীতি

ছেলে **বীতপাল**। সমসাময়িক একটি লিপিতে সোমপুরী মহাবিহারের শিল্পরীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, **"জগতের নয়নের একমাত্র বিরামস্থল অর্থাৎ দর্শনীয় বস্তু।" পালযুগে অষ্টধাতুর ও কালোপাথরের তৈরী দেবদেবীর মূর্তিগুলি সৃজনশীলতার পরিচয় দেয়। মূল্যবান কষ্টিপাথরের তৈরী বহু মূর্তি পালদের ভাস্কর্যের সাক্ষ্য বহন করে।** বিভিন্ন ভঙ্গির **নারীমূর্তি** ও **দেবদেবীর মূর্তি পোড়ামাটির ফলকে সুন্দরভাবে খোদাই করা আছে।** সেনযুগে বহু খ্যাতনামা শিল্পীর উদ্ভব ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে

সেনযুগের শিল্প

বরেন্দ্রভূমির **শূলপাণি** উল্লেখ্য। অন্য শিল্পীদের মধ্যে **কর্ণভদ্র, বিষ্ণুভদ্র, তথাগতসাগর, সূত্রধর প্রমুখের শিল্পপ্রতিভা প্রশংসার দাবি রাখে।** বল্লালসেনের **'বল্লালবাড়ি'** স্থাপত্যশিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

● **চিত্রকলা : রামপালের** সময়ে রচিত **'অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'** নামক এক পুঁথিতে বহু ছবি দেখে চিত্র শিল্পের দক্ষতার কথা জানা যায়। পালযুগে বজ্রযান ও তন্ত্রযান ধর্মের বিষয়কে কেন্দ্র করে চিত্রগুলি আঁকা হয়। চিত্রের চরিদিকে কালো বা লাল রং-এর সরু রেখা টানা হত। **ডঃ এস. কে. সরস্বতী** পাল চিত্রকলার ওপর প্রচুর গবেষণা করেছেন। কেম্ব্রিজ সংগ্রহশালা, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল ও অক্সফোর্ডের বোডেলিয়ান গ্রন্থাগারে পালযুগের চিত্রকলার বহু তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা আছে।

করেছিল।

শিল্প ও শিল্পগিল্ড

ভারতের কৃষিতে বহু পণ্যের উৎপাদন শুরু হয়েছিল, অনেক কৃষিজ পণ্য ছিল শিল্প-পণ্যের উপকরণ। আখ, তুলো, নীল প্রভৃতি কৃষিজ পণ্যকে কেন্দ্র করে শিল্প গড়ে উঠেছিল। ভারতে এযুগে চিনি শিল্প গড়ে উঠেছিল। *দেশীনামমালা*-তে আখ মাড়াই যন্ত্রকে 'হস্তযন্ত্র' বা পীড়নযন্ত্র বলা হয়েছে। রাজস্থানের অর্থুনা লেখতে চিনি ও গুড় শিল্পের উল্লেখ আছে। চাওজুকুয়া জানিয়েছেন যে আদি মধ্যযুগের মালবে প্রচুর চিনি উৎপন্ন হত, এই চিনি গুজরাটে রপ্তানি করা হত। আখের মতো বস্ত্রবয়ন ছিল একটি প্রধান শিল্প। হেমচন্দ্র *অভিধান চিন্তামণি*-তে তুলো পেঁজার জন্য ধনুক ব্যবহার করা হত বলে জানিয়েছেন, *অমরকোষ*-এ তুলো পেঁজার ধনুকের কথা আছে। একাদশ শতকে রচিত *মানসোল্লাস*-এ ভারতের প্রধান বস্ত্রশিল্প কেন্দ্রগুলির উল্লেখ আছে। মুলতান (মূলস্থান), গুজরাটের আনহিলবারা, বঙ্গ (দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গদেশ), নাগপট্টন (তাঞ্জোর) ও চোলদেশে বস্ত্র উৎপন্ন হত। *রাজতরঙ্গিণী*-তে পাটনকে বস্ত্রকেন্দ্র রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। চাওজুকুয়া মালব ও গুজরাটের বস্ত্রশিল্পের কথা বলেছেন। মার্কোপোলো দাক্ষিণাত্যের বরঙ্গল রাজ্যের বস্ত্রশিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বাংলার বস্ত্র সম্পর্কে বিদেশিরা প্রশংসা করেছেন। আল-মাসুদি, ইবন খোরদাদবা, আল-ইদ্রিসি, চাওজুকুয়া সকলে বাংলার বস্ত্রের প্রশংসা করেছেন। তবে কৌশাম্বী, মগধ ও মথুরার মতো বস্ত্রশিল্পকেন্দ্রের উল্লেখ সমকালীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। সম্ভবত এসব শিল্পকেন্দ্রের অবক্ষয় ঘটেছিল, আদিমধ্য যুগে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি ঘটেছিল কামরূপে।

তৈলবীজের উৎপাদন বেড়েছিল, সেইসঙ্গে তৈল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। বহু লেখতে তৈলিকদের উল্লেখ আছে। তৈল নিষ্কাশনের জন্য দুরকমের যন্ত্র ছিল—ঔদ্র ও চক্রিক। চক্রিক হল ঘানিযন্ত্র, সম্ভবত ঘানির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছিল। ধাতুশিল্পের প্রসার ঘটেছিল বলে জানা যায়। রামশরণ শর্মা লোহার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে জানিয়েছেন। দ্বাদশ শতকের একখানি গ্রন্থে (*পর্যায়মুক্তাবলী*) ছয়রকম লোহার উল্লেখ করা হয়েছে। ওড়িশার মন্দিরগুলিতে লোহার ব্যবহার হয়েছিল, রাজারা প্রচুর তাম্রশাসন চালু করেন। অনুমান করা অসংগত নয় যে তামার ব্যবহার বেড়েছিল। আদিমধ্য যুগে

বিভিন্ন অঞ্চলে বহু ধাতুমূর্তি নির্মিত হয়, এর মধ্যে ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলি প্রাধান্য পেয়েছিল। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে বহু ধাতুমূর্তি পাওয়া গেছে। ভারতে উৎকৃষ্ট মানের তরবারি নির্মিত হত, আরব লেখকেরা পাল সাম্রাজ্যে নির্মিত তরবারির প্রশংসা করেছেন। মগধ ও অঙ্গে ভালো তরবারির উল্লেখ আছে। বারাণসী, সৌরাষ্ট্র ও কলিঙ্গেও ভালো তরবারি তৈরি হত বলে জানা যায়। ধাতুর ব্যবহারের জন্য জ্বালানির প্রয়োজন হয়, ভারতীয়রা কয়লা ও কাঠকয়লার ব্যবহার শিখেছিল। অধ্যাপক ভক্তপ্রসাদ মজুমদার *দেশীনামমালার* ভিত্তিতে তা প্রমাণ করেছেন।

সমসাময়িক লেখ, ধর্মশাস্ত্র ও বিভিন্ন তথ্যসূত্রে শিল্পীদের গিল্ড বা শ্রেণির উল্লেখ আছে। গিল্ড হল শিল্পী-কারিগরদের সংগঠন। সম্ভবত আদিমধ্য যুগে গিল্ডের প্রভাব খানিকটা কমেছিল, সদস্যদের ওপর গিল্ডের প্রভাব আগের মতো ছিল না। লালনজি গোপাল দেখিয়েছেন যে গিল্ড ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মেনে নিয়েছিল, সদস্যদের স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, যৌথস্বার্থ এতে খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন যে কর ফাঁকি, জুয়া খেলা ও বারাঙ্গনার উপস্থিতি ঘটলে রাজা গিল্ডের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। আগে রাজা গিল্ডের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না। নারদস্মৃতি থেকে অনুমান করা যায় যে গিল্ডের পরিচালনার ওপর রাজার হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পেয়েছিল, গিল্ডের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা এতে অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের সাহিত্যে শ্রেণিকরণের উল্লেখ আছে। শ্রেণিকরণ হল প্রশাসনিক দপ্তর যা গিল্ডগুলির তত্ত্বাবধান করত। আদিমধ্য যুগের শ্রেণিগুলিকে 'জাতি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, জাতি ও শ্রেণি ছিল সমার্থক শব্দ। বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রেণিকে সংকর বা মিশ্রজাতির বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্ত্রকাররা মিশ্রজাতিকে কখনো ভালো চোখে দেখেননি। কুম্ভকার, তাঁতি, স্বর্ণকার, রজতকার প্রভৃতি হল শুদ্ধ জাতি, চর্মকার, তেলি, ইক্ষুপীড়নকারী, রঙ্গকার, কাঁসারি প্রভৃতি হল অশুদ্ধ। জীনসেন সূরির চোখে স্বর্ণকার, কুম্ভকার, কর্মকার, কারিগর প্রভৃতি সামাজিক গোষ্ঠীর লোকেরা হল নিম্নমানের, অধম পর্যায়ভুক্ত।

সমকালীন লেখমালায় শ্রেণির উল্লেখ আছে। গোয়ালিয়র লেখতে অন্তত কুড়িজন তৈলিক প্রধান ও চোদ্দজন মালাকার প্রধানের নাম পাওয়া যায়। এছাড়া সুরা প্রস্তুতকারীদের শ্রেণি ছিল, পাথরকাটা কারিগরদের সংগঠন ছিল। প্রাক-৬৫০ পর্বে একটি বৃত্তিকে ঘিরে একজন প্রধানের নেতৃত্বে শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। এই পর্বে (৬৫০-১২০০) এক বৃত্তির মধ্যে একাধিক শ্রেণি গড়ে উঠেছিল বলে অনুমান করা হয়। শ্রেণির যে দৃঢ়বদ্ধ রূপটি আগে দেখা গিয়েছিল তার অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে আদিমধ্য যুগে একটি বৃত্তিকে ঘিরে একটিমাত্র শ্রেণি ছিল না। শ্রেণিগুলি এক একটি পরিবারকে আশ্রয় করে গড়ে উঠতে থাকে। এক পেশায় অনেক সংগঠন এবং একাধিক নেতার আবির্ভাব ঘটে। শ্রেণির সংগঠনে

অবশ্যই ভাঙন দেখা দিয়েছিল। ভক্তপ্রসাদ মজুমদার মনে করেন যে আদিমধ্য যুগে ভূস্বামীদের প্রভাব বেড়েছিল, শ্রমিকদের একটা বড়ো অংশ কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়েছিল। এজন্য শিল্পগিল্ডের পরিচালনায় শ্রমের অভাব ঘটেছিল। আগে গিল্ডগুলি ব্যাংকিং-এর কাজ করত, গিল্ডের ব্যাংকিং ভূমিকা এ পর্বে অনেকটা ম্লান হয়েছিল। অর্থ লগ্নি করার দৃষ্টান্ত আছে তবে সে অর্থ রাখা হয় শ্রেণিপ্রধানের কাছে, শ্রেণির কাছে নয়। রাজকীয় হস্তক্ষেপ, শ্রেণিগুলির জাতিতে রূপান্তর, শ্রেণিগুলির পারিবারিক সংগঠনের আকার ধারণ, অর্থলগ্নির ঘটনার বিরলতা প্রমাণ করে যে আদিমধ্য যুগে শ্রেণির অবনমন ঘটেছিল।

পল্লব শিল্প (Pallava Art) :

■ **স্থাপত্য :** দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাস পল্লব আমলের মন্দিরগুলিকেই শুরু হয়েছে। পল্লব যুগের এই মন্দিরগুলিতেই প্রথম *দ্রাবিড় শিল্পরীতির* সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দ্রাবিড় রীতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই মন্দিরগুলির উচ্চতা পিরামিডের মতো। মন্দিরগুলি বহুতলবিশিষ্ট। সর্বনিম্ন স্তরে গর্ভগৃহ থাকত, প্রতিটি তলেই তার অনুরূপ বিন্যাস লক্ষ করা যায়—তবে প্রতিটি তলেই র আয়তন নিম্নতর তল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হতে থাকে। মন্দিরের শীর্ষদেশ গম্বুজাকৃতি। শাস্ত্রে একে *স্তূপ* বা *স্তূপিকা* বলা হয়। একেবারে নীচের তলায় অবস্থিত চতুষ্কোণ র্ভগৃহ। এর চারদিকে থাকে একটি বৃহত্তর চতুষ্কোণ আচ্ছাদিত বেষ্টনী, যা 'প্রদক্ষিণ পথ' মে পরিচিত। পরবর্তীকালে মূল মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে স্তম্ভযুক্ত হলঘর, বেশদ্বার বা বড়ো গোপুরম।

বিড় রীতি

পল্লব যুগের মন্দিরগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—**(১)** পাহাড়-কাটা মন্দির এবং) স্বাধীনভাবে তৈরি মন্দির। **(১)** পল্লব যুগের প্রথম পর্বের স্থাপত্য-নিদর্শনগুলি সবই হাড় কেটে তৈরি। এই পাহাড়-কাটা স্থাপত্যকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। **(ক)** পল্লব-জ **প্রথম মহেন্দ্রবর্মন**-এর রাজত্বকালে (৬০০-৬২৫ খ্রিঃ) নির্মিত মন্দিরগুলি ছিল

স্তম্ভযুক্ত। পাহাড় কেটে গুহা তৈরি হত এবং ত্রিকোণ বা গোলাকার স্তম্ভ দিয়ে মন্দিরের ছাদটিকে ধরে রাখা হত। এটি '*মহেন্দ্র রীতি*' নামে পরিচিত। ত্রিচিনোপল্লি, চেঙ্গলপেট এবং আর্কট জেলায় এ ধরনের মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

মহেন্দ্র রীতি

মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্বকালের প্রথম দিকের মন্দিরগুলি ছিল অতি সাধারণ ধরনের, কিন্তু পরবর্তীকালে শিল্পরীতিতে পরিবর্তন আসে এবং মন্দিরের অলঙ্করণও বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। এর দুটি উদাহরণ দেওয়া যায়—বৌদ্ধ বিহারের অনুকরণে তৈরি গুন্টুর জেলার *অনন্তশায়ন মন্দির* এবং উত্তর আর্কট জেলার *ভৈরবকোণ্ডের মন্দির*। অনন্তশায়ন মন্দিরটি চারতলা—এর উচ্চতা ৫০ ফুট। এর স্তম্ভগুলিতে সুন্দর শিল্পকর্ম পরিলক্ষিত হয়। ভৈরবকোণ্ডের মন্দির আরও বড়ো এবং স্তম্ভগুলির অলঙ্করণ উন্নততর।

(খ) প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র **প্রথম নরসিংহবর্মন**-এর রাজত্বকালে (৬২৫-৬৭৫ খ্রিঃ) *মামল্ল রীতি* বা *মহামল্ল রীতি*-র সূচনা হয়। এই রীতির বৈশিষ্ট্য হল পাহাড় কেটে একটি প্রস্তর-খণ্ডে রথের আকৃতিতে মন্দির নির্মাণ। **(i)** চেন্নাই (মাদ্রাজ) শহরের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে মামল্লপুরমে (মহাবলীপুরম) এ ধরনের সাতটি রথ বা রথমন্দির পাওয়া গেছে। এই রথগুলি পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদী ও গণেশের নামাঙ্কিত। এগুলিকে একত্রে '*সপ্ত প্যাগোডা*' বলা হয়। এই রথ বা রথমন্দিরগুলি হল আসলে শিবমন্দির। রথগুলির আয়তন মোটামুটি একই রকম, তবে সর্ববৃহৎ রথটির দৈর্ঘ্য ৪২ ফুট, প্রস্থ ৩৫ ফুট এবং উচ্চতা হল ৪০ ফুট। এই শিল্পরীতি *একশিলা* বা *রথশৈলী* নামেও পরিচিত। রথগুলির ভিতরের দিক অসম্পূর্ণ হলেও, এর বাইরের দিক অসাধারণ সূক্ষ্ম ভাস্কর্যের কাজে পূর্ণ। সমালোচকদের মতে এই রথগুলির মধ্য দিয়ে পল্লব স্থাপত্যের এক অধ্যায়ের সমাপ্তি এবং এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। **(ii)** মহামল্ল রীতি অনুসারে পাহাড় খোদাই করে **মণ্ডপ** বা **গুহা** নির্মাণ করা হয়। মামল্লপুরমে এ ধরনের সতেরোটি গুহামন্দির নির্মিত হয়। এগুলির মধ্যে *মহিষমর্দিনী, আদিবরাহ, বরাহ, ত্রিমূর্তি* প্রভৃতি গুহামন্দির উল্লেখযোগ্য। এই মণ্ডপগুলি মহেন্দ্রবর্মনের মণ্ডপগুলির তুলনায় উন্নত।

মহামল্ল রীতি

(২) মহামল্ল যুগের পর গুহামন্দির বা রথমন্দিরের পরিবর্তে পাথর দিয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মন্দির নির্মাণ শুরু হল। পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে এই রীতির মন্দির তৈরি হত। এই অধ্যায়ের মন্দিরগুলি দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত—*রাজসিংহ গোষ্ঠীর* (৭০০-৮০০ খ্রিঃ) *মন্দির* এবং *নন্দীবর্মন গোষ্ঠীর* (৮০০-৯০০ খ্রিঃ) *মন্দির*। **(ক) রাজসিংহ গোষ্ঠীর** মন্দিরের সংখ্যা ছয়। এদের মধ্যে তিনটি মন্দির মামল্লপুরমে—তির মন্দির, ঈশ্বর মন্দির ও মুকুন্দ মন্দির। একটি মন্দির আছে আর্কটের পনমলইয়ে। অন্য দুটি মন্দির হল কাঞ্চিপুরমের কৈলাসনাথ মন্দির এবং বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির। **(খ) নন্দীবর্মন গোষ্ঠীর** আমলের মন্দিরগুলি আগের পর্যায়ের মতো উজ্জ্বল নয়। মন্দিরের আয়তনও ছোটো। এই মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাঞ্চিপুরমের মুক্তেশ্বর ও মতঙ্গেশ্বর মন্দির।

রাজসিংহ গোষ্ঠী ও নন্দীবর্মন গোষ্ঠী

(৩) পল্লব স্থাপত্যের শেষ ধাপ হল *অপরাজিত রীতি*। অপরাজিত পল্লব এই রীতি প্রবর্তন করেন। এই রীতির নিজস্ব কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না। এই রীতি পল্লব শিল্পকে ক্রমশ চোল শিল্পের নিকটবর্তী করেছিল।

■ **ভাস্কর্য ঃ** ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও পল্লব যুগ ছিল খুবই উন্নত। বলা হয় যে, পল্লব ভাস্কর্য ...ই দক্ষিণ ভারতের ভাস্কর্য শিল্পের সূচনা। প্রথম পর্বের পল্লব ভাস্কর্যে শেষ দিকের বেঙ্গি ...র্যের প্রভাব ছিল সমধিক। (১) মামল্লপুরমের রথমন্দিরগুলিতে অঙ্কিত বিভিন্ন দেব-...ী ও মানবমূর্তিগুলি পল্লব ভাস্কর্যের অসামান্য নিদর্শন। মানবমূর্তিগুলির মধ্যে আছে ...ব-রাজ সিংহবিষ্ণু, প্রথম মহেন্দ্রবর্মন ও নরসিংহবর্মনের প্রতিকৃতি। প্রথম দুই রাজার ...র তাঁদের রানিদের প্রতিকৃতিও এখানে আছে। (২) পল্লব ভাস্কর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন ... মহাবলীপুরমের *'গঙ্গাবতরণ'* রিলিফটি। এক সময় সমালোচকরা এই রিলিফটিকে ...ীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনির সঙ্গে যুক্ত করতেন। অধুনা সমালোচকরা বলেন যে, ... রিলিফে *কিরাতার্জুনের* পৌরাণিক কাহিনি বিবৃত হয়েছে। সমুদ্রমুখী পাহাড়ের পুরো ...দিক জুড়ে প্রায় ৯০ ফুট লম্বা ও ২৩ ফুট উঁচু এই মহাকাব্যিক রিলিফটি পাহাড়ের গা ...টে খোদাই করা হয়েছে। অসংখ্য মানুষ, জীবজন্তু, দেবতা, অর্ধদেবতা, সন্ন্যাসী—সবই ...নে উপস্থিত। এখানে মূর্তিগুলি সজীব ও স্বাভাবিক। সমালোচকদের মতে পশুর প্রতি ... মমত্ববোধ পল্লব ভাস্কর্য ছাড়া প্রাচ্যের আর কোনও ভাস্কর্যে পাওয়া যায় না। ...বলীপুরমের এই রিলিফটিকে বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য বলা হয়। ***গ্রেসেইট*** বলেন ... "It is vast picture, a regular fresco in stone, a master-piece of classic ...." (৩) পল্লব গুহামন্দিরগুলির দেওয়ালে ভাস্কর্যের কাজও অতুলনীয়। *কৃষ্ণমণ্ডপে* ...পালকের জীবন-কাহিনি, *মহিষমর্দিনী মণ্ডপে* দেবী দুর্গার সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ-দৃশ্য, ...ন্তশয্যায় বিষ্ণুর মাথার উপর ছত্র হিসেবে ফণাধারী শেষনাগ, বরাহ অবতারের দৃশ্য ...তি ভাস্কর্যের দৃশ্য অতুলনীয়। এছাড়া, *বরাহ-গুহার* ভাস্কর্য-মণ্ডিত থামগুলিও অপূর্ব। ...ব ভাস্কর্যে বেঙ্গির প্রভাব থাকলেও এই প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসছিল। বেঙ্গির ...নায় পল্লব-মূর্তিগুলি ছিল অনেক বেশি প্রাণবন্ত এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থেকে মুক্ত। ...জন্তা-ইলোরার রহস্যঘন অতীন্দ্রিয়তা এবং আলোছায়ার খেলা এখানে অনুপস্থিত।

■ **চিত্রকলা ঃ** এই যুগে চিত্রকলার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। (১) **প্রথম ...হেন্দ্রবর্মনের** রাজত্বকালের সূচনায় সিওনভাসল-এর জৈন মন্দিরে অপূর্ব চিত্রকলার ...র্শন পাওয়া যায়। তাঁর আমলের কিছু গুহামন্দির—বিশেষত মামন্দুরে পল্লব শিল্পকলার ... নিদর্শন চোখে পড়ে। (২) **দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন রাজসিংহ**-র আমলে নির্মিত পন্মলই ...কাঞ্চিপুরমের মন্দিরগুলিতেও চিত্রকলার বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। পন্মলই ...দিরের চিত্রকলায় দেখা যাচ্ছে যে, পার্বতী আনন্দের সঙ্গে শিব-নৃত্য প্রত্যক্ষ করছেন। ...ঞ্চির কৈলাসনাথ মন্দিরের কক্ষগুলিতেও কিছু চিত্র অঙ্কিত আছে। একটি চিত্রে 'সোমস্কন্দ' ...র্থাৎ শিব, পার্বতী ও তাঁদের পুত্র স্কন্দ বা কার্তিক আছেন। পাদুকোট্টাই রাজ্যেও পল্লব ...কলার কিছু নিদর্শন লক্ষ করা যায়।[১]

■ আরবদের সিন্ধু জয়ের ফলাফল ঃ সিন্ধুদেশে আরব অধিকার তিনশো বছর স্থায়ী ... রাজনৈতিক দিক থেকে এই ঘটনার কোনও সুদূরপ্রসারী ফলাফল ছিল না। ইংরেজ ঐতিহাসিক ***স্ট্যানলি লেনপুল*** (Lane-poole)-এর মতে, আরবদের সিন্ধুজয় ভারত ও ইসলামের ইতিহাসে ফলাফলহীন একটি ...মাত্র।[১] কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক ***স্যার উলস্‌লি হেইগ*** (W. Haig) বলেন যে, সিন্ধুতে ...বদের অধিষ্ঠান ছিল একটি সামান্য উপাখ্যান, এবং একটি বিরাট দেশের অতি ক্ষুদ্রতম ...শে তাদের স্বল্পস্থায়ী কর্মকাণ্ড সীমিত ছিল।[২] ***ডঃ শ্রীবাস্তব*** বলেন যে, রাজনৈতিক বিচারে ...লাম ও ভারতের দিক থেকে আরবদের সিন্ধুজয় একটি গুরুত্বহীন ঘটনা।[৩] ***হাবিবউল্লাহ*** (Dr. A. B. M. Habibullah)-র মতে, ভারতে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইসলামকে ...ষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আরবরা অগ্রসর হয় নি। বিশাল এই ভারতীয় মহাদেশের এক প্রান্তকে ...দের আক্রমণ নাড়া দিতে পেরেছিল মাত্র এবং তাও মিলিয়ে গিয়েছিল স্বল্পকালের মধ্যেই।

...ভারতে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাসে সিন্ধুজয় প্রথম পদক্ষেপ হলেও ...রাজনৈতিক ভারতের ইতিহাসে এই ঘটনা কোনও স্থায়ী রেখাপাত করে নি। আরব আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি এবং তা একমাত্র সিন্ধুতেই সীমাবদ্ধ ...—সিন্ধুদেশকে কেন্দ্র করে কখনোই তা ভারতের অন্তর্দেশে বিস্তৃত হতে পারে নি।

---

১. "...... an episode in the history of India and of Islam, a triumph without results."—Stanley Lane-poole.

২. "It was a mere episode in the history of India and affected only a small fringe of that vast country."

৩. "From the political point of view the Arab Conquest of Sindh was an insignificant event in the history of Islam and also in that of India."—*The Sultanate of Delhi*, A. L. Srivastava, P. 23.

ভারতের বৃহত্তর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিম শক্তিকে কেবলমাত্র সিন্ধুদেশেই প্রায় তিনশো বছর আবদ্ধ থাকতে হয়। সিন্ধুদেশে কিছু মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও ভারতের ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, শাসনপদ্ধতি বা সামাজিক রীতিনীতির উপর আরব শাসনের কোনও প্রভাব পড়ে নি।

সিন্ধু জয়ের বহু পূর্ব থেকেই আরবদের সঙ্গে ভারতের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু-বিজয়ের পর তা আরও ঘনিষ্ঠ ও সুদৃঢ় হয়। সিন্ধুদেশকে ভিত্তি করে সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আরব বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরে আরব বাণিজ্যপোতগুলির যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। সিন্ধুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাণিজ্য উপকরণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চালান করে আরব বণিকরা মুনাফা অর্জন করতে থাকে। সিন্ধুর বণিকরা আরব দেশের প্রায় প্রতিটি শহরে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে।

বাণিজ্যিক

রাজনৈতিক দিক থেকে নিষ্ফলা হলেও আরব আক্রমণের পরোক্ষ ফল ছিল সুদূরপ্রসারী—বিশেষত সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই ফল ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। ডঃ শ্রীবাস্তব বলেন যে, আরবদের সিন্ধু জয়ের ফলে ভারতের মাটিতে ইসলামের ভিত রচিত হয় এবং এর উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী আক্রমণকারীরা ভারতে এই ধর্মমতের বিকাশ ঘটায়।[১] আরবরা ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা যথেষ্টভাবে প্রভাবিত হয়। সিন্ধু অঞ্চলে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে আরবরা ভারতীয় দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, ভেষজ, রসায়ন, সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। খলিফা মনসুর-এর আমলে ভারত থেকে বেশ কিছু হিন্দু পণ্ডিত, সংগীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী ও রাজমিস্ত্রী আরবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। খলিফা মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রহ্মগুপ্ত রচিত *'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত'* ও *'খণ্ড-খাদ্যক'* নামে জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবীয় ভাষায় অনূদিত হয়। আমির খসরুর রচনা থেকে জানা যায় যে, আরব জ্যোতির্বিদ আবু মাশর বারাণসীতে দশ বছর ধরে জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। খলিফা হারুন-অল-রশিদ-এর আমলে (৭৮৬-৮০৮ খ্রিঃ) এই যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয়। আরবীয় পণ্ডিতদের রচনায় **মনাকা, বিজয়কর, সিন্দবাদ** প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতের উল্লেখ আছে। বাগদাদের চিকিৎসালয় ও হাসপাতালগুলিতে বহু ভারতীয় চিকিৎসক নিযুক্ত ছিলেন। এইসব পণ্ডিত ও চিকিৎসকদের পদপ্রান্তে বসে আরবীয় শিক্ষার্থীরা জ্ঞানচর্চা করতেন। আরবের মাধ্যমে এই জ্ঞানভাণ্ডার ইউরোপে সম্প্রসারিত হয়।[২] ***ডঃ শ্রীবাস্তব*** বলেন যে, অষ্টম ও নবম শতকে ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্তির পশ্চাতে ভারতের সঙ্গে আরবদের যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

সাংস্কৃতিক

অধ্যাপক হ্যাভেল (Prof. Havell)-এর মতে, গ্রিস নয়—ইসলামের আদি পর্বে ই ছিল ইসলামের শিক্ষক। তিনি বলেন যে, ভারতের সঙ্গে সংযোগের ফলে আরবীয় রোপীয় সভ্যতা যথেষ্ট পুষ্ট হয়েছিল।[২] ডঃ সতীশ চন্দ্র (Dr. Satish Chandra) যে, আরবীয় পণ্ডিতরা বাগদাদে বসে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার যে সুযোগ ছিলেন, ভারতীয় পণ্ডিতরা কিন্তু তা পান নি। তাই ভারতে আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঘটে নি। ভারতে আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবেশ ঘটলে দুই সভ্যতার সমন্বয়ে ভারত এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হত।

মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান ঃ তরাইনের যুদ্ধ (The Indian expeditions of Muhammad of Ghur : The Battles of Tarain) ঃ

সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন উচ্চাকাঙ্খী সুলতান। শুধুমাত্র গজনী ও পৈত্রিক ঘুর রাজ্য নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকেননি। আফগানিস্থানের উচ্চ পার্বত্য ভূমি হতে ভারতের শস্যশ্যামলা প্রান্তরের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে। পশ্চিমে খারাজম রাজার দৃঢ় ক্ষমতা থাকার জন্যে পশ্চিম দিকে রাজ্য বিস্তারের সুযোগ মুহাম্মদ ঘুরীর ছিল না। এই কারণে পূর্ব সীমান্তে ভারতের অভিমুখে তিনি তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তারের চেষ্টা করেন। সুলতান মামুদ ভারত হতে যে বিরাট ধনরত্ন লুঠ করে নিয়ে যান সেই কিংবদন্তী আফগানিস্থান ও মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং মুহাম্মদ ঘুরীও ভারতের ধন-সম্পদের জন্যে প্রলুব্ধ হন। তবে সুলতান মামুদের মত শুধুমাত্র লুণ্ঠন তাঁর লক্ষ্য ছিল না। ভারতের ধনসম্পদের দ্বারা তিনি তাঁর সৈন্যদলকে শক্তিশালী করেন। নিছক লুণ্ঠনের জন্যে তিনি লুণ্ঠন করেননি। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন। এজন্য তিনি সুলতান মামুদের মত ঘন ঘন অভিযান পরিচালনা করেননি। তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর প্রতি অভিযান পাঠান। তিনি বিজিত অংশে আপন আধিপত্য দৃঢ় করার পর পরবর্তী অভিযান পরিচালনা করতেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করে নিজ রাজ্যভুক্ত করা ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। এজন্য তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে একমাত্র লক্ষ্য নিয়ে তাঁর সমগ্র উদ্যমকে নিয়োগ করেন।.

মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের কারণ

ঘুরী বংশের আক্রমণে গজনীর উচ্ছেদপ্রাপ্ত সুলতান বাহারাম শাহ গজনী হতে পালিয়ে তাঁর ভারতীয় রাজ্য পাঞ্জাবে আশ্রয় নেন। বাহারাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র খসরু শাহ লাহোরে থেকে পাঞ্জাব শাসন করতে থাকেন। তিনি ঘুরী আক্রমণের আশঙ্কায় খাইবার গিরিপথকে সুরক্ষিত করেন। কারণ এই পথে সুলতান মামুদ ভারতে আসেন। চতুর মুহাম্মদ ঘুরী খাইবারের পথ ত্যাগ করে গোমাল গিরিপথ দিয়ে সিন্ধু ও মূলতানে ঢুকে পড়েন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পাঞ্জাবে গজনী বংশীয় সুলতান খসরু শাহকে বেষ্টিত করা এবং তাঁর বাধা এড়িয়ে ভারতের ভিতর ঢুকে পড়া। এভাবেই তিনি পাঞ্জাব থেকে গজনী শক্তিকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেন।

গজনীর বাহরাম শাহের বংশকে পাঞ্জাব হতে উচ্ছেদের লক্ষ্য গ্রহণ

১১৭৫ খ্রীঃ মুহাম্মদ ঘুরী মুলতান আক্রমণ করে কারমানম্থিয় বা ইসমাইলি সম্প্রদায়ের শাসন থেকে মুলতানকে নিজ শাসনে আনেন। এর পর মুহাম্মদ সিন্ধুর উচ্ অঞ্চল আক্রমণ করে উচ্ দুর্গ অধিকার করেন। তাঁর সেনাপতি নাসিরউদ্দিন কুবাচাকে সিন্ধুর শাসনকর্তা হিসাবে তিনি নিয়োগ করেন। এর পর মুহাম্মদ ঘুরী আনহিলওয়ারা বা নাহারওয়ালা রাজ্য আক্রমণ করেন। এই স্থানটি ছিল গুজরাটে। রাজপুতানায় সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আনহিলওয়ারা অবস্থিত ছিল। ডঃ নিজামীর মতে, মুহাম্মদ ঘুরীর লক্ষ্য ছিল গুজরাট জয় করে, এই পথে দাক্ষিণাত্যে ঢুকে দক্ষিণের ধন-সম্পদ লুঠ করা। কিন্তু আবু পাহাড়ের যুদ্ধে আনহিলওয়ারার রাজা দ্বিতীয়

মুলতান ও সিন্ধুজয় আনহিলওয়ারায় পরাজয় বরণ

১· Comprehensive History of India. Vol. II.

মুলরাজ মুহাম্মদকে পরাস্ত করেন। ১১৭৮ খ্রীঃ গুজরাটের চালুক্য রাজা ভীমদেব মুহাম্মদ ঘুরীকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করায় মুহাম্মদ বুঝতে পারেন যে সিন্ধু মুলতানের পথে ভারতের ভিতর ঢোকা সম্ভব হবে না।

খসরু শাহকে পরাস্তকরণ ও পাঞ্জাব জয়

১১৭৯ খ্রীঃ থেকে মুহাম্মদ ঘুরী তাঁর রণ পরিকল্পনা পরিবর্তন করে পাঞ্জাবের পথে ভারতের ভিতর ঢোকার সঙ্কল্প করেন। মুহাম্মদ বুঝতে পারেন যে, গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা হল ভারতের হৃদপিণ্ড। এই স্থানে যেতে হলে পাঞ্জাবের পথেই তাঁকে আগাতে হবে। এ সময় পশ্চিম পাঞ্জাবে সুলতান মামুদের বংশধর খসরু শাহ গজনী হতে বিতাড়িত হয়ে রাজত্ব করতেন। লাহোরের দুর্গের যুদ্ধে মুহাম্মদ খসরু শাহকে ১১৮৬ খ্রীঃ পরাস্ত করে লাহোর দুর্গ অধিকার করেন। খসরু শাহ বন্দী হলে মুহাম্মদ ঘুরীর আদেশে নিহত হন। ঘুরী এরপর শিয়ালকোটসহ সমগ্র পশ্চিম পাঞ্জাব অধিকার করেন। সিন্ধু ও লাহোরকে ভারতে তাঁর পাদপীঠ হিসাবে গঠন করে, মুহাম্মদ ঘুরী ভারত বিজয়ে এগিয়ে আসেন।

তরাইনের প্রথম যুদ্ধ ১১৯১ খ্রীঃ

পূর্ব পাঞ্জাব তখন ছিল আজমীর ও দিল্লীর অধিপতি চৌহান বংশীয় তৃতীয় পৃথ্বীরাজের অধীনে। তৃতীয় পৃথ্বীরাজ বা রায়পিথোরা ছিলেন বিখ্যাত যোদ্ধা। মুহাম্মদ ঘুরী পশ্চিম পাঞ্জাব অধিকার করলে তিনি বিপদ বুঝে তাঁর সীমান্ত দুর্গ তবরহিন্দ বা ভাতিন্ডাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন। মুহাম্মদ ঘুরী তাঁকে পাশ কাটিয়ে পূর্ব পাঞ্জাবে ঢুকে পড়ার উপক্রম করলে পৃথ্বীরাজ পিছিয়ে এসে দিল্লী থেকে ৮০ মাইল দূরে তরাইনের প্রান্তরে তাঁকে বাধা দেন। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১ খ্রীঃ) পৃথ্বীরাজের সেনাপতি গোবিন্দ রাওয়ের আক্রমণে মুহাম্মদ আহত হন।[১] তাঁর সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এক খলজী সেনাপতি আহত মুহাম্মদকে নিজ ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে তাঁকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেন। মুহাম্মদ তরাইনের প্রথম যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে ঘুর রাজ্যে ফিরে আসেন।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১১৯২ খ্রীঃ

এর পর মুহাম্মদ এক বছর ধরে পরবর্তী আক্রমণ হানার জন্যে প্রাণপণে প্রস্তুতি করেন। যে সকল সেনা ও সেনাপতি তরাইনের প্রথম যুদ্ধে দুর্বলতা দেখায় তিনি তাদের কঠোর শাস্তি দেন। প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার বাছাই সেনা এবং তিন বিশ্বস্ত সেনাপতি যথা কুতবউদ্দিন আইবেক, নাসিরুদ্দিন কুবাচা ও তাজউদ্দিন ইলদুজের সাহায্য নিয়ে তিনি পুনরায় দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসেন। পৃথ্বীরাজ এবারও তরাইনের প্রান্তরে (১১৯২ খ্রীঃ) তার গতিরোধ করেন। কিন্তু মুহাম্মদের তীরন্দাজ ও অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণে তাঁর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পৃথ্বীরাজ নিজে তুর্কী সেনাদের হাতে বন্দী হন। হাসান নিজামীর মতে বিজয়ী মুহাম্মদ, পৃথ্বীরাজকে তাঁর সামন্ত রাজা হিসাবে আজমীরে রাজত্ব করার অনুমতি দেন। সংস্কৃত গ্রন্থ বিরুদ্ধবিধি—বিদ্ধবংশ ও পৃথ্বীরাজের মুদ্রা থেকে একথা সমর্থিত হয়। পরে পৃথ্বীরাজ মুহাম্মদের বিরোধিতা করার চেষ্টা করলে তাঁকে নিহত করা হয়। আজমীরের সিংহাসনে মুহাম্মদের অনুগত সামন্ত হিসাবে কিছুকাল পৃথ্বীরাজের পুত্র রাজত্ব করেন। এরপর মুহাম্মদ ঘুরীর নির্দেশে তাঁর সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবেক দিল্লী দখল করেন। আজমেরও তুর্কীদের অধিকারে চলে যায়।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতের

১· ফিরিস্তার দেওয়া প্রথম তরাইনের যুদ্ধের বিবরণে বলা হয়েছে যে মুহাম্মদ আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ... তাঁকে উদ্ধার করে।

দরজা তুর্কী আক্রমণকারীদের কাছে খুলে যায়। পূর্ব পাঞ্জাব ও দিল্লী তুর্কী অধিকারে গেলে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় তুর্কীরা সহজে ঢুকে পড়তে পারে। আজমীরের পতনের ফলে রাজপুতানার দরজাও তুর্কীদের কাছে খুলে যায়। সুতরাং তরাইনের বিজয় ছিল ভারতে তুর্কী শাসন স্থাপনের একটি প্রধান ধাপ।

তরাইনে মহম্মদ ঘুরীর জয়লাভের ফল

দ্বিতীয়তঃ, পৃথ্বীরাজের শোচনীয় পরাজয়ের ফলে অন্যান্য রাজপুত রাজারা মনোবল হারিয়ে ফেলে। ১৪৮ বছর আগে সুলতান মামুদ ভারতের আত্মরক্ষা ব্যবস্থায় যে বিরাট ধ্বস সৃষ্টি করেন তা এই দীর্ঘ দিনে মেরামত হয়নি এটা ভালভাবে বুঝা যায়। ভারতীয় সেনারা রণকৌশলে তুর্কীদের তুলনায় নিকৃষ্ট একথা স্পষ্ট হয়ে যায়। তৃতীয়তঃ, সুলতান মামুদ কেবলমাত্র লুঠপাটের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করেন। কিন্তু মুহাম্মদ ঘুরী স্থায়ী রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই অভিযান চালান। সুতরাং তাঁর বিজয় ভারতে স্থায়ী তুর্কী সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনা করে।

সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর আরব্ধ কাজ তাঁর নির্দেশ মত তাঁর ক্রীতদাস সেনাপতি কুতবউদ্দিন আইবেক সম্পন্ন করার কাজে হাত দেন। তিনি রণথম্ভোর দুর্গ অধিকার করেন। তিনি দিল্লীর সামরিক গুরুত্ব বুঝতে পেয়ে তাঁর শাসনকেন্দ্র দিল্লীতে স্থানান্তর করেন। ইতিমধ্যে তিনি মীরাট, বুলান্দসর ও আলিগড় জয় করেন। এই স্থানগুলি ছিল জয়চন্দ্র গাহড়বালের রাজ্যভুক্ত। ১১৯৪ খ্রীঃ মুহাম্মদ ঘুরী পুনরায় ভারতে আসেন। তিনি চান্দোয়ারের যুদ্ধে জয়চন্দ্র গাহড়বালকে পরাজিত ও নিহত করে কনৌজ অধিকার করেন এবং বারাণসী আক্রমণ করে ৩০০ হাতী পান। ১১৯৫ খ্রীঃ মুহাম্মদ গোয়ালিয়র জয় করেন। তাঁর সেনাপতি বাহাউদ্দিন তুঘ্রিল ১ ১/২ বছরের অবরোধের পর গোয়ালিয়র দুর্গ দখল করেন। মুহাম্মদ ঘুর রাজ্যে ফিরে গেলে কুতবউদ্দিন আইবেক অনহিলওয়ারা ও গুজরাট জয় করে তাঁর প্রভুর কাজ সম্পন্ন করেন। ১২০১ খ্রীঃ কুতবউদ্দিন বুন্দেলখণ্ড এবং ১২০২ খ্রীঃ কালিঞ্জর দুর্গ জয় করে তাঁর রাজ্য জয় সম্পূর্ণ করেন।

গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় তুর্কী বিজয়

মুহাম্মদ ঘুরী ও তাঁর সেনাপতি কুতবউদ্দিন আইবক উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে তুর্কী অধিকার স্থাপন করলেও পূর্ব ভারতের বাংলা ও বিহার তখনও সেন রাজাদের অধিকারে ছিল। তুর্কী জায়গীরদার বক্তিয়ার খলজী ১২০৩ খ্রীঃ কুতবউদ্দিন আইবকের অনুমতি নিয়ে বিহার জয় করেন। এই সময় তিনি ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত ওদন্তপুরী বিহার ধ্বংস করেন। ১২০৫-৬ খ্রীঃ বক্তিয়ার খলজী বাংলা আক্রমণ করে নদীয়া ও পশ্চিমবাংলা অধিকার করেন। এর ফলে তুর্কী শাসন বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

বাংলা-বিহার জয়

মুহাম্মদ ঘুরী ১২০৫ খ্রীঃ শেষবারের মত ভারতে আসেন। তিনি বিদ্রোহী খোক্কর উপজাতিকে দমনের জন্যে কাংড়া ও কাশ্মীর সীমান্তে অবস্থান করেন। এই সময় জনৈক গুপ্তঘাতক তাঁকে নিহত করে। মুহাম্মদ ঘুরীর উত্তরাধিকারীরূপে কুতবউদ্দিন আইবক দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ গুপ্ত শাসনব্যবস্থা (Gupta Administration) ঃ

গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে ভারত সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন ভারতীয় ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল ও স্মরণীয় অধ্যায়। গুপ্ত শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য প্রধান উপ... হল প্রত্নতাত্ত্বিক। (১) *এলাহাবাদ প্রশস্তি, দামোদরপুর লিপি,* ... *সিল লিপি* ও *বিভিন্ন ভূমিপট্টলি* থেকে এ সম্পর্কে নানা তথ্য ... যায়। (২) এছাড়া শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক,* কালিদাসের *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* কামন্দ... *'নীতিসার'* এবং (৩) বিভিন্ন *স্মৃতিশাস্ত্রগুলি* যথা—*কাত্যায়ন-স্মৃতি, মনু-স্মৃতি, নারদ-*... *যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি* থেকেও নানা তথ্যাদি পাওয়া যায়। (৪) চৈনিক পরিব্রাজক ফা হি... বিবরণও আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে।

উৎস

মৌর্য যুগের মতো গুপ্ত শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন রাজা এবং রাজপদ ... বংশানুক্রমিক। গুপ্ত রাজারা দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। মৌর্য রাজারা যেখানে নি... *'দেবানাম্ পিয়'* বলে অভিহিত করতেন, সেখানে গুপ্তরা ... নিজেদের দেবতার সমকক্ষ বলে দাবি করতেন। মৌর্য স... সাধারণ *'রাজন'* উপাধি গ্রহণ করতেন। অপরদিকে সমসাময়িক লিপিতে গুপ্ত রা... *'অচিন্ত্যপুরুষ', 'লোকধামদেব', 'পরম দৈবত', 'মহারাজাধিরাজ', 'পরমরাজা*... *'পৃথ্বিপাল', 'পরমেশ্বর', 'পরমভট্টারক'* প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে। এ... প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তকে *'মর্ত্যলোকের ঈশ্বর'* এবং *'ধনদা-বরুণেন্দ্রন্তক-সম'* অর্থাৎ ধনদ (কুবের), ইন্দ্র, বরুণ এবং অন্তকের (যমের) সমকক্ষ বলা হয়েছে। তাঁকে *'কৃ... (যম) যুদ্ধ-কুঠার'* রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

রাজার দৈবস্বত্ব

রাজা রাজ্যে সর্বেসর্বা ছিলেন। সমরবিভাগ, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ পরি... রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন, প্রাদেশিক শাসনক... অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে রাজাই ...

রাজার ক্ষমতা

সর্বেসর্বা। তিনি ছিলেন দেশের সব জমির মালিক এবং সর্বক্ষমতার উৎস। এ সত্ত্বেও তিনি কিন্তু কখনোই স্বেচ্ছাচারী বা স্বৈরাচারী ছিলেন না। রাজাকে চিরাচরিত প্রথা, ধর্মশাস্ত্র ও ব্রাহ্মণদের বিধান মেনে চলতে হত। গুপ্ত রাজারা মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়েছিলেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান ও গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতেও প্রচুর ক্ষমতা ছিল। রাজা সাধারণত তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না। এছাড়া, প্রজাদের মঙ্গল সাধন ও জনপ্রিয়তা অর্জনের দিকেও তাঁদের যথেষ্ট লক্ষ ছিল।

স্বৈরাচারী নন

রাজার পরেই ছিল **যুবরাজের** স্থান। রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক এবং রাজারা উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতেন। সাধারণত জ্যেষ্ঠপুত্রই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত হতেন—তবে যোগ্যতার প্রশ্নে এর ব্যতিক্রমও ঘটত। এই মনোনয়নের ফলাফল অবশ্য সর্বদা মঙ্গলজনক হয় নি। যুবরাজ বা উত্তরাধিকারী শাসনকার্যে সম্রাটকে সাহায্য করতেন। তাঁকে সামরিক ও বে-সামরিক—দুটি বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হত। উদ্দেশ্য হল অভিজ্ঞতা অর্জন।

যুবরাজ

কেন্দ্রে রাজাকে সাহায্যের জন্য **মন্ত্রী, যুবরাজ ও উচ্চ রাজকর্মচারীরা** নিযুক্ত হতেন। মন্ত্রীরা এককভাবে রাজাকে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতেন। মৌর্যদের মতো এই যুগে *মন্ত্রী পরিষদ* ছিল কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে—তবে এই যুগে মন্ত্রীপদ বংশানুক্রমিক হয়ে ওঠে। মন্ত্রীরা ছিলেন সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী। অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—*'মহাবলাধিকৃত'* (প্রধান সেনাপতি), *'মহাদণ্ডনায়ক'* (সেনাপতি), *'মহাপ্রতিহার'* (প্রধান দ্বাররক্ষক), *'সন্ধিবিগ্রহিক'* (বৈদেশিক বিষয়ক, যুদ্ধ ও শান্তির ভারপ্রাপ্ত), *'অক্ষপটলাধিকৃত'* (সরকারি দলিলপত্র রচনা ও রক্ষার ভারপ্রাপ্ত)। *'কুমারমাত্য'* ও *'অযুক্ত'* নামক কর্মচারীরা কেন্দ্র ও প্রাদেশিক শাসনের মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখতেন।

রাজকর্মচারী

শাসনকার্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সাম্রাজ্যকে কয়েকটি *প্রদেশে* ভাগ করা হয়েছিল। এই যুগে প্রদেশগুলিকে বলা হত *'ভুক্তি'*, *'দেশ'*, *'প্রদেশ'* ও *'ভোগ'*। উদাহরণ হিসেবে পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি (উত্তরবঙ্গ), তীরভুক্তি (উত্তর বিহার), সৌরাষ্ট্রদেশ, সুকুলিদেশ প্রভৃতি প্রদেশের নাম করা যায়। ভুক্তিগুলি গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। সাধারণত *'উপরিক'* বা *'উপরিক মহারাজা'* বা অনেক সময় *'মহারাজ-পুত্র-দেবভট্টারক'* উপাধিধারী রাজপুত্রগণ 'ভুক্তি'-র শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন। 'দেশ'-এর শাসনকর্তাদের *'গোপতি'* এবং 'ভোগ'-এর শাসনকর্তাদের *'ভোগপতি'* বা *'ভোগিকা'* বলা হত।

প্রাদেশিক শাসন

প্রদেশগুলি *'বিষয়'* বা জেলায় বিভক্ত ছিল। 'বিষয়' শাসনের দায়িত্ব ছিল *'বিষয়পতি'*, *'কুমারমাত্য'* বা *'আযুক্ত'* নামক কর্মচারীর উপর। জেলার শাসকগণ সাধারণত প্রদেশপাল বা গভর্নর-কর্তৃক নিযুক্ত হতেন, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্রাট জেলাশাসকদের নিয়োগ করতেন। জেলাশাসককে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করবার জন্য নানা কর্মচারী ছিলেন। *'শৌল্কিক'* ছিলেন কর-আদায়কারী, *'গৌল্মিক'* ছিলেন দুর্গ ও বনসম্পদের দায়িত্বপ্রাপ্ত। ভূমিরাজস্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন

জেলার শাসন

'ধ্রুবাধিকরণিক'। খাজাঞ্চিখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন *'ভাণ্ডাগারাধিকৃত'*। *'বলভটক'* ছিলেন হিসাব পরীক্ষক। প্রত্যেক জেলায় মহাফেজখানা থাকত এবং তার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন *'মহাক্ষপটলিক'*। এছাড়া জেলাতে *'লেখক'*, *'করণিক'* প্রভৃতি কর্মচারী ছিলেন।

জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ গুপ্ত শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিষয়পতিদের সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক জেলায় *'পুরোগ'* নামে একটি পরিষদ বা বেসরকারি সভা থাকত। *'নগরশ্রেষ্ঠী'* বা নগরের মহাজনদের প্রতিনিধি, *'সার্থবহ'* বা ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি, *'প্রথম কুলিক'* বা শিল্পী সমবায়ের প্রতিনিধি এবং *'প্রথম কায়স্থ'* বা করণিকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই সভা গঠিত হত।

নির্বাচিত পরিষদ

কতকগুলি গ্রাম নিয়ে জেলা বা *'বিষয়'* গড়ে উঠত এবং গ্রাম ছিল শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন একক। গ্রামের শাসনভার ছিল *'গ্রামিক'* নামক সরকারি কর্মচারীর উপর। গ্রামের প্রধান বা মোড়লকে বলা হত *'মহত্তর'* বা *'ভোজক'*। ইনি গ্রাম শাসনে *'গ্রামিক'*-কে সাহায্য করতেন। এছাড়া গ্রামের বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ ও মোড়লদের নিয়ে গঠিত *'পঞ্চমণ্ডলী'* বা *'গ্রামজনপদ'* নামে একটি সভা শাসন পরিচালনা বিষয়ে গ্রামিককে পরামর্শ দিত। এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ না মিললেও এটা ঠিক যে, এই সভা স্থানীয় বিষয়াদি যথা—শিক্ষা, পথঘাট, শান্তি প্রভৃতির দিকে নজর রাখত।

গ্রাম শাসন

জনবহুল শহরগুলিতে *'অধিকরণ'* বা *'নিগম সভা'* পৌর শাসন পরিচালনা করত। নগরশ্রেষ্ঠী, সার্থবহ, প্রথম কুলিক, প্রথম কায়স্থ প্রভৃতি ব্যক্তিদের নিয়ে *'নিগম সভা'* গঠিত হত। নগর শাসনের প্রধানকে বলা হত *'পুরপাল'* বা *'নগররক্ষক'*। *'পুরপাল উপরিক'* নামে একশ্রেণির কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত তিনি পুরপালদের কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। *'অবস্থিক'* নামক কর্মচারীরা নগরের ধর্মশালাগুলি তত্ত্বাবধান করতেন। গুপ্ত শাসনব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণকে ঐতিহাসিক ***ইউ. এন. ঘোষাল*** "শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে গুপ্ত সম্রাটদের এক সাহসী পদক্ষেপ" ("......one of the boldest administrative experiments of the Imperial Guptas.") বলে অভিহিত করেছেন।

নগর শাসন

গুপ্ত আমলেই প্রথম আইন ও বিচার ব্যবস্থার যথাযথ বিকাশ ঘটেছিল। এই যুগে আইন-সংক্রান্ত প্রচুর গ্রন্থ রচিত হয় এবং সর্বপ্রথম ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইন-কানুনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। এই যুগের আইনগ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন **যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি** ও **কাত্যায়ন**। *'কাত্যায়ন-স্মৃতি'*-র মতে বিচার বিভাগে রাজাই সর্বেসর্বা, তিনি নিজে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন এবং এ কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন অন্যান্য বিচারক, মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণরা। শহরাঞ্চলে বিচারককে সাহায্য করতেন *নগরশ্রেষ্ঠী, সার্থবহ* ও অন্যান্য ব্যক্তিরা। গ্রামে *পঞ্চায়েত* বিচারকার্য পরিচালনা করত।

আইন ও বিচার ব্যবস্থা

ফা-হিয়েনের রচনা থেকে গুপ্তদের উদার দণ্ডনীতির কথা জানা যায়। তাঁর মতে অপরাধীর প্রাণদণ্ড বা অঙ্গচ্ছেদ হত না—অর্থদণ্ডই ছিল দণ্ড। কেবলমাত্র রাজদ্রোহীদেরই অঙ্গচ্ছেদ করা হত। বলা বাহুল্য, এ বক্তব্য

দণ্ডনীতি

সঠিক নয় কারণ কালিদাসের রচনা, *'মুদ্রারাক্ষস'* নাটক ও স্কন্দগুপ্তের *জুনাগড় লিপিতে* প্রাণদণ্ড, অঙ্গচ্ছেদ, হাতির পদতলে পিষ্ট করা প্রভৃতি নিষ্ঠুর দণ্ডবিধির উল্লেখ আছে।

রাজস্ব

গুপ্তযুগে রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল ভূমি। উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ বা এক-চতুর্থাংশ ছিল ভূমিকর। একে বলা হত *'ভাগ'*। কর্মচারীদের বেতনের উপর কর ধার্য করা হত। একে বলা হত *'ভোগ'*। এছাড়া বাণিজ্য ও শিল্পদ্রব্য থেকে শুল্ক, খনি, লবণ, জঙ্গল, ফেরিঘাট, বাজার, খনি প্রভৃতি থেকে কর আদায় করা হত। বৈদেশিক আক্রমণকালে *'মল্লকর'* নামে একপ্রকার কর আরোপ করা হত। সরকারি কাজে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান করতে হত। একে বলা হত *'বিষ্টি'*। এই যুগে জমির মালিকানা নিয়ে বিতর্ক আছে। ***ডঃ ইউ. এন. ঘোষাল*** বলেন যে, এই যুগে কৃষক জমি চাষ করলেও জমির মালিকানা ছিল রাজার। জমি দান বা বিক্রয় করতে গেলে রাজার অনুমতি লাগত। সবাই অবশ্য এ বক্তব্য মানেন না। তাঁদের মতে, জমির মালিকানা ছিল কৃষকের, তবে জমি দান অথবা বিক্রয় করতে গেলে স্থানীয় প্রশাসন বা রাজার অনুমতি নিতে হত।

সেনাবাহিনী

গুপ্ত রাজারা যে এক সুবিশাল ও সুনিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই—যদিও তাদের সামরিক সংগঠন সম্পর্কে আমাদের হাতে কোনও তথ্য নেই। গুপ্তদের সেনাদলের সংখ্যা কত ছিল তাও জানা যায় না। মনে হয় সামন্তরাজারাই সম্রাটকে সেনা সরবরাহ করতেন। এই বাহিনী পদাতিক, অশ্ববাহিনী, হস্তিবাহিনী ও নৌবাহিনী—এই চারভাগে বিভক্ত ছিল। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে *মহাদণ্ডনায়ক, মহাবলাধিকৃত, সন্ধিবিগ্রহিক* ছিলেন উল্লেখযোগ্য। সে যুগে প্রধান যুদ্ধাস্ত্র ছিল বর্শা, তির-ধনুক, কুঠার ও তরবারি।

প্রকৃতি

(১) গুপ্ত শাসকরা ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী হলেও তাঁরা কখনোই স্বেচ্ছাচারী বা স্বৈরাচারী ছিলেন না—চিরাচরিত প্রথা, দেশাচার ও ধর্মশাস্ত্রের বিধান মেনে তাঁদের শাসনকার্য পরিচালনা করতে হত। (২) মৌর্যদের মতো গুপ্ত শাসনব্যবস্থা অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত ছিল না। এখানে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার এক সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছিল। এখানে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত ছিল। জেলা, গ্রাম ও নগর শাসনে স্থানীয় প্রতিনিধিরাই সিদ্ধান্ত নিতেন। (৩) গুপ্ত রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও তাঁরা পরধর্মসহিষ্ণু এবং যথেষ্ট উদার ছিলেন। (৪) গুপ্ত শাসনব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। গুপ্তরা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতেন। সরকারি কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে জমি দেওয়া হত, যার শাসনভার ছিল জমিগ্রহিতার উপর। এইভাবে দেশে সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ গুপ্তযুগ ঃ সুবর্ণ যুগ (Gupta Period : Golden Age) ঃ

সুবর্ণ যুগ

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে গুপ্তযুগ এক স্মরণীয় অধ্যায়। এই যুগে সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানচর্চা, ধর্ম—জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এক অভূতপূর্ব উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। গুপ্ত যুগকে তাই *'সুবর্ণ যুগ'* বলে আখ্যায়িত করা হয়। ***ঐতিহাসিক বার্নেট*** (Barnett) গুপ্ত যুগকে গ্রিসের ইতিহাসের

পেরিক্লিসের যুগ, রোমের ইতিহাসের *অগাস্টাসের যুগ* এবং ইংল্যান্ডের ইতিহাসের *এলিজাবেথের যুগ*-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।[১]

ডঃ স্মিথ-এর মতে, প্রধানত বৈদেশিক সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগের ফলেই এই সুবর্ণ যুগের উত্থান সম্ভব হয়েছিল। বলা বাহুল্য, স্মিথের এই বক্তব্য সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ গুপ্ত যুগের এই সাংস্কৃতিক বিকাশে গ্রিক, রোমান ও চৈনিক প্রভাব কিছু থাকলেও তা কখনোই প্রধান নয়। মৌর্যোত্তর যুগে শুঙ্গ-শাসনাধীনে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের সূচনা, গুপ্তযুগে রাজনৈতিক ঐক্য, সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা, দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং রাজন্যবর্গের উদারতা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতাই হল গুপ্ত যুগের এই সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের কারণ।

কারণ

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই যুগে অভূতপূর্ব উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃত ভাষাই ছিল এই যুগে সাহিত্যের মাধ্যম, তবে এই যুগকে *'সংস্কৃত ভাষার পুনরুত্থানের যুগ'* হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না, কারণ মৌর্যযুগে সংস্কৃত ভাষা রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হলেও, সংস্কৃত কিন্তু কখনও অবলুপ্ত হয় নি। সংস্কৃত সাহিত্যে এই যুগে নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার আবির্ভাব হয়। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত সুপণ্ডিত ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'কবিরাজ' বা 'শ্রেষ্ঠ কবি'। *এলাহাবাদ প্রশস্তি*-তে তাঁর সভাকবি হরিষেণের কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী বীরসেন-ও একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। গুপ্ত যুগকে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র রচনার স্বর্ণযুগ বললে অত্যুক্তি হয় না। বিশিষ্ট দার্শনিক ***ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান***-এর মতে, দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে এই যুগে বহু মৌলিক তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। *যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি, কাত্যায়ন-স্মৃতি, ব্যাস-স্মৃতি, বৃহস্পতি-স্মৃতি, দেবল-স্মৃতি, নারদ-স্মৃতি* প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রগুলি এই যুগে রচিত হয়। অষ্টাদশ পুরাণের বেশ কয়েকটি এই যুগে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয় এবং রামায়ণ ও মহাভারত তাদের বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে। বিশিষ্ট শাস্ত্রকার **ঈশ্বরকৃষ্ণ, বসুবন্ধু, অসঙ্গ,** গৌরপাদ, ন্যায়দর্শনের ব্যাখ্যাকার **পক্ষিলস্বামিন,** বৌদ্ধ দার্শনিক **দিন্নগাচার্য** এবং বিশিষ্ট বৈয়াকরণ **ভর্তৃহরি, পাণিনি ও পতঞ্জলি** এই যুগেই আবির্ভূত হন। *'মুদ্রারাক্ষস'* প্রণেতা **বিশাখদত্ত,** *'মৃচ্ছকটিক'* প্রণেতা **শূদ্রক,** *'কিরীতার্জুনীয়ম্'* প্রণেতা **ভারবি,** *'ভট্টিকাব্য'* প্রণেতা **ভট্টি,** *'পঞ্চতন্ত্র'* প্রণেতা **বিষ্ণুশর্মা,** *'দশকুমারচরিত'* প্রণেতা **দণ্ডী,** *'শব্দকোষ'* বা অভিধান প্রণেতা **অমর সিংহ** তাঁদের সৃজনশীল রচনা দ্বারা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনেন। মহাকবি **কালিদাস** এই যুগের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাঁর *'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্', 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'* নাটক এবং *'মেঘদূতম্', 'কুমারসম্ভবম্', 'ঋতুসংহার'* প্রভৃতি মহাকাব্য বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সাহিত্য

চিকিৎসাশাস্ত্র, ধাতুবিদ্যা, রসায়ণ, গণিত, জ্যোতিষচর্চা—বিজ্ঞানের সব দিকেই ভারতীয় মনীষার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। **ধন্বন্তরী** ও **বাগভট্ট** এই যুগেই তাঁদের চিকিৎসা-সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি রচনা করেন। অনেকের ধারণা যে, বিখ্যাত শল্যবিদ **সুশ্রুত** এই যুগের মানুষ ছিলেন। সেনাবাহিনীর সুবিধার্থে এই যুগেই প্রথম পশুচিকিৎসা-সংক্রান্ত গ্রন্থ রচিত হয়।

১. "The Gupta period is in the annals ... Periclean age is in the ...

বিজ্ঞান

ধাতুবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হলেও এই যুগের বিশেষ কোনও ধাতুনির্মিত দ্রব্য মেলেনি। দিল্লির নিকটে প্রাপ্ত মেহেরৌলি লৌহস্তম্ভটি আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই স্তম্ভের গায়ে আজও কোনও মরচে পড়ে নি বা এর মসৃণতা সামান্যতম নষ্ট হয় নি। নালন্দায় প্রাপ্ত তাম্রনির্মিত বুদ্ধমূর্তিটি, বিভিন্ন রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা এবং সিলমোহরের মধ্যেও ধাতুবিদ্যার উন্নতির নিদর্শন পাওয়া যায়। পিথাগোরাসের *'থিয়োরেম'* এবং ত্রিকোণমিতির *'সাইন'*, *'কোসাইন'* প্রভৃতি চিহ্নের সঙ্গে ভারতীয়রা পরিচিত ছিলেন। ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যার আবিষ্কার ও শূন্যের ব্যবহার, যা আরবীয় সংখ্যাতত্ত্ব নামে পরিচিত, তা ভারতীয়দেরই সৃষ্টি। ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা পঞ্চম শতাব্দী থেকেই দশমিকের ব্যবহার শুরু করেন। *'সূর্য-সিদ্ধান্ত'* গ্রন্থের রচয়িতা বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ **আর্যভট্ট** আবিষ্কার করেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয়। তিনি আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথম সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ-এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। বছরে যে ৩৬৫ দিন—এ গণনা তাঁরই। *'বৃহৎ-সংহিতা'* ও *'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'* গ্রন্থের রচয়িতা **বরাহমিহির** জ্যোতির্বিজ্ঞানকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন—জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্র। নিউটনের বহু শতাব্দী পূর্বে **ব্রহ্মগুপ্ত** ইঙ্গিত দেন যে, বস্তুসমূহ পার্থিব অভিকর্ষের টানেই মাটিতে পড়ে।

ধর্ম

গুপ্ত যুগকে অনেকে *'হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের যুগ'* বলে চিহ্নিত করেন। বলা বাহুল্য, এ মত ঠিক নয়। পুনরুত্থানের যুগ নয়—বরং এই যুগকে *'হিন্দু ধর্মের পুনর্গঠনের যুগ'* বলা যেতে পারে। হিন্দুধর্ম কখনোই অবলুপ্ত হয় নি। মৌর্যযুগে সাময়িকভাবে তা স্তিমিত হয়ে পড়লেও, গুপ্ত যুগের বহু পূর্বেই তার অগ্রগতির সূচনা হয়। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম এই যুগে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। এই যুগে বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র তাঁদের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেন এবং শিব, বিষ্ণু, কার্তিক, গণেশ, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মীর উপাসনা শুরু হয়। তাঁদের পূজার জন্য নতুন নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি রচিত হয়। বৈদিক যাগযজ্ঞের গুরুত্ব কমে আসে এবং ভক্তিমূলক ধর্মের বিকাশ ঘটে। এই যুগে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন হয় ও তন্ত্রধর্ম প্রসারিত হয়। নতুন দেবতাদের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য পুরাণের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। এই কারণে এই যুগের হিন্দু ধর্মকে বৈদিক হিন্দুধর্ম না বলে অনেকে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বলেন। ***ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়*** এই যুগের হিন্দু ধর্মকে "পুরোনো ও নতুন ধর্মীয় আদর্শের সমন্বয়যুক্ত বিভিন্ন ধরনের মোজাইক" বলেছেন।[1] গুপ্ত রাজারা হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ, জৈন ও অপরাপর ধর্মের প্রতি সহনশীল ছিলেন। বৌদ্ধ দার্শনিক **অসঙ্গ, কুমারজীব, নাগার্জুন, বসুবন্ধু** ও **পরমার্থ** এ যুগেই আবির্ভূত হন এবং তাঁদের রচনার মাধ্যমে মহাযান ধর্মমত অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অজন্তা, সারনাথ প্রভৃতি স্থানের শিল্প নিদর্শনগুলি বৌদ্ধ ধর্মের প্রাণশক্তির পরিচয় বহন করে।[2]

1. "It was a va

স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প প্রভৃতির দিক থেকেও গুপ্তযুগ এক সৃজনশীল অধ্যায়। এই যুগে পূর্ববর্তী **স্থাপত্য** রীতির চরম বিকাশ ও নতুন রীতির সূচনা দেখা যায়। পাহাড় কেটে বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু **গুহামন্দির** স্থাপন এই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অজন্তা, ইলোরা, উদয়গিরির গুহামন্দিরগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। **মন্দির স্থাপত্যের** ক্ষেত্রেও গুপ্তযুগ এক নবযুগ। এই যুগেই প্রথম স্থায়ী বস্তু অর্থাৎ ইট ও পাথর দিয়ে মন্দির নির্মাণ শুরু হয় এবং পাথরের সাহায্যে মন্দির নির্মাণ-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি রচিত হতে শুরু করে। কেটেশ্বর মন্দির, মণিনাগের মন্দির, সাঁচির মন্দির, দেওগড়ের দশাবতার মন্দির, তিগোয়ার বিষ্ণুমন্দির, ভূমারের শিবমন্দির, কুবীরের পার্বতী মন্দির প্রভৃতি এই যুগের মন্দির স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। গান্ধার শিল্পের প্রভাব খর্ব করে এই যুগে **ভাস্কর্যের** এক নতুন রীতি গড়ে ওঠে। সারনাথে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি হল এই যুগের ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দেহের সুষমা, রেখার ব্যঞ্জনা, ধ্যানানন্দের অপূর্ব প্রশান্তি এই মূর্তিটিতে অদ্ভুতভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। সারনাথে প্রাপ্ত মঞ্জুশ্রী অবলোকিতেশ্বর মূর্তি, সাঁচির বোধিসত্ত্ব ও মথুরার ব্রোঞ্জনির্মিত বুদ্ধমূর্তি এই যুগের ভাস্কর্যশিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ভারতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ শিবমূর্তি এই যুগে নির্মিত হয়। পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে রাম, কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর মূর্তি এই যুগের ভাস্কর্যের উৎকর্ষ প্রমাণ করে। **চিত্রশিল্পের** ইতিহাসেও এই যুগ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বর্ণে ও রেখায়, ভাবে ও ব্যঞ্জনায় এগুলি অতুলনীয়। জলরঙে অঙ্কিত বাঘ, অজন্তা ও ইলোরার প্রাচীর-চিত্রগুলি বিশ্ববিখ্যাত। চিত্রের বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বিচিত্র। কেবলমাত্র ধর্মীয় বিষয়বস্তু নয়—বুদ্ধ ও জাতকের কাহিনি অবলম্বনে রচিত চিত্রগুলিতে রাজা, রাজ-দরবার, ঋষি, বন, নগর, অরণ্য, সাধারণ নর-নারী—সবার চিত্রই উপস্থাপিত হয়েছে। অজন্তার ঊনত্রিশটি গুহা এই চিত্রে পরিপূর্ণ।

গুহামন্দির, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প

গুপ্তযুগে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। মালয় দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, কম্বোজ, যবদ্বীপ, বালি, আন্নাম, বোর্নিও প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূত্র ধরে ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তৃত হয় এবং বিভিন্ন ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠতে থাকে। গুপ্তযুগে এইসব অঞ্চলে ভারতীয় নামধারী বহু রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। এইসব অঞ্চলে ভারতীয় ধর্ম, রীতি-নীতি, ভাষা, লিপি সবকিছুই সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত হয়।

বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতা

সাম্প্রতিককালে কিছু ঐতিহাসিক গুপ্ত যুগকে *'সুবর্ণ যুগ'* বলে অভিহিত করার বিরোধিতা করেছেন। **ডঃ *রোমিলা থাপার*** বলেন যে, এই যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষদের জন্য সৃষ্ট এবং তাদেরই বিনোদনের বাহন—নিম্নশ্রেণির মানুষদের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক ছিল না। সংস্কৃত ছিল উচ্চশ্রেণির শিক্ষিত মানুষের ভাষা। সাধারণ মানুষ প্রাকৃত ভাষার কথা বলত এবং গুপ্তদের কাছে তা অবহেলিত ছিল। এই যুগের শিল্প ও ভাস্কর্যও ছিল উচ্চশ্রেণির বিনোদনের জন্য। এইসব ঐতিহাসিকের মতে, এই যুগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু সমৃদ্ধি ঘটলেও, তা উচ্চশ্রেণির মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—সাধারণ মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হয় নি। কৃষি-অর্থনীতি প্রাধান্য পাওয়ায় কারিগরি শিল্প ও বাণিজ্য আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

গুপ্তযুগ কি সুবর্ণ যুগ?

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ায় মুদ্রা-অর্থনীতির সঙ্কোচন ঘটে। বলা হয় যে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও এই যুগে বহু প্রাচীন নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে, সাম্রাজ্যের নানা স্থানে ভূমিদাস প্রথার উদ্ভব ঘটে, জমির মালিকানা হস্তান্তরিত হলে কৃষকও হস্তান্তরিত হত, নারীসমাজ সম্পূর্ণভাবে পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে, নারীদের বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ ব্যাপক আকার ধারণ করে, বর্ণপ্রথা পূর্বের চেয়ে কঠোরতর রূপ পরিগ্রহ করে, নিম্নবর্ণের অবস্থা শোচনীয় হয়, চণ্ডালদের অবস্থা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, অস্পৃশ্যতা নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু হয় এবং বর্ণবিভক্ত সমাজব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা হয়। এ যুগের প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা মিলেছে, যা পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোনও যুগেই পাওয়া যায় নি। এ থেকে বোঝা যায় যে, এ যুগে বিলাসদ্রব্যের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল, কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিনিময়ের বাহন *রৌপ্যমুদ্রা, দিনার, রূপক* প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু নতুন সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এই যুগকে 'সুবর্ণ যুগ' বলা যায় না, কারণ সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পাশাপাশিই ছিল অবক্ষয় ও দুর্দশার চিত্র। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগকে 'সুবর্ণ যুগ' বললেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কখনোই তা ঠিক নয়।[১]

সমুদ্রগুপ্ত, ৩৪০-৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ

৮.৪ **সিংহাসনারোহণ :** 'এলাহাবাদ-স্তম্ভলিপি'* হইতে জানা যায় যে, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন এবং চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তের মনোনয়নের কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলে তাঁহার আত্মীয়বর্গ (তুল্য-কুলজ') মর্মাহত হইয়াছিলেন। 'এলাহাবাদ-স্তম্ভলিপির' এইরূপ উল্লেখের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে মনে করেন যে, সম্ভবত প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর রাজপরিবারে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিরোধের উদ্ভব হইয়াছিল। কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রায় 'কচ' নামে এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। স্মিথের মতে 'কচ' ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের প্রতিদ্বন্দ্বী অপর এক ভ্রাতা এবং সমুদ্রগুপ্ত তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবত সমুদ্রগুপ্ত ও কচ ছিলেন অভিন্ন। সমুদ্রগুপ্তের পূর্বনাম ছিল কচ এবং রাজ্যজয়ের পর তিনি 'সমুদ্রগুপ্ত' নাম ধারণ করেন। এতদ্ভিন্ন তথাকথিত কচ কর্তৃক প্রচারিত স্বর্ণমুদ্রার অপর দিকে 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা' উপাধিটি একমাত্র সমুদ্রগুপ্তের প্রতিই প্রযুক্ত করা হইয়াছে।

সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণের যথার্থ কাল সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় না।

সিংহাসনারোহণকাল সম্পর্কে মতভেদ

'নালন্দার-তাম্রলিপি' অনুসারে তিনি ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ডক্টর মজুমদারের মতে সমুদ্রগুপ্ত ৩৪০ ও ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ডক্টর মুখার্জি (আর. কে.)-এর মতে সমুদ্রগুপ্ত ৩২৫ হইতে ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেন।

* 'এলাহাবাদ-স্তম্ভলিপি' বা 'হরিষেণ প্রশস্তি'—অশোকের একটি স্তম্ভে গুপ্ত রাজকবি হরিষেণ কর্তৃক রচিত প্রশস্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এলাহাবাদের দুর্গে এই স্তম্ভখানি রাখা আছে। ইহাতে কোন তারিখ নাই। ফ্লিটের মতে প্রশস্তিখানি সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরই উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ফ্লিটের মন্তব্য সমর্থিত হয় নাই। সম্ভবত সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণ-ভারত বিজয়ের পরই ইহা রচিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে প্রশস্তিখানির গুরুত্ব যথেষ্ট। ইহাতে কবি হরিষেণের কাব্য-প্রতিভারও পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার কতকাংশ পদ্যে রচিত। ইহাতে সমুদ্রগুপ্তের শিক্ষা, বিদ্যোৎসাহিতা, রাজ্যজয় ও রাজ্যশাসন প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে। ইহা ভিন্ন, ইহাতে ভারতের সমকালীন অবস্থাও বর্ণিত আছে।

প্রধান উপাদান

এলাহাবাদ স্তম্ভে উৎকীর্ণ রাজকবি হরিষেণ রচিত প্রশস্তি, সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক প্রচারিত স্বর্ণমুদ্রা ও চৈনিক ঐতিহাসিকদের রচিত গ্রন্থাদি হইতে সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

রাজ্যজয় : রাজ্যজয়ের জন্য সমুদ্রগুপ্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং এই কারণে স্মিথ তাঁহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। হরিষেণ রচিত প্রশস্তি হইতে সমুদ্রগুপ্তের সামরিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা

মহাপদ্মনন্দ ও চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্যের ন্যায় সমুদ্রগুপ্তও দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কৌটিল্য কর্তৃক প্রচারিত রাষ্ট্রীয় নীতির তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। "শক্তিমান মাত্রই যুদ্ধ করিবে ও শত্রু নিপাত করিবে"—কৌটিল্যের এই নীতি সমুদ্রগুপ্ত অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন।

(১) **উত্তর-ভারত :** 'এলাহাবাদ-প্রশস্তি' অনুসারে সমুদ্রগুপ্ত উত্তর-ভারতের নয়জন রাজাকে পরাজিত করিয়া উহাদের রাজ্য স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এই নয়জন রাজা ছিলেন রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মণ, গণপতিনাগ, অচ্যুত, নাগসেন, নন্দীন, বলবর্মণ প্রভৃতি। 'হরিষেণ-প্রশস্তিতে' বলা হইয়াছে যে, এই সকল নৃপতিদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করিয়া সমুদ্রগুপ্ত পুষ্পনগরে আনন্দ উপভোগ করেন। অচ্যুত সম্ভবত বেরিলির সন্নিকটে অহিচ্ছত্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। নাগসেন ছিলেন গোয়ালিয়রের অন্তর্গত পদ্মাবতীর নাগবংশের রাজা। গণপতিনাগের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। মুদ্রার সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে অনেকে গণপতিকে মথুরার রাজা বলিয়া মনে করেন। 'হরিষেণ-প্রশস্তিতে' উল্লিখিত পুষ্পনগর বলিতে কান্যকুব্জ বা কনৌজ বোঝায় ; কারণ প্রাচীনকালে কান্যকুব্জের নাম ছিল পুষ্পপুর। অনেকের মতে কান্যকুব্জ হইতেই সমুদ্রগুপ্ত উল্লিখিত রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীনকালে পাটলিপুত্রের অপর একটি নাম ছিল পুষ্পপুর। এই কারণে কেহ কেহ মনে করেন যে, সমুদ্রগুপ্ত জয়লাভ করিয়া পাটলিপুত্রে বিজয়গর্বে প্রবেশ করেন। রুদ্রদেব (বা প্রথম রুদ্রসেন) ছিলেন বকাটকবংশের রাজা। সম্ভবত তাঁহার রাজ্যের পূর্বাংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। গণপতিনাগ ছিলেন নাগসেনের উত্তরাধিকারী এবং ধরের অধিপতি ('ধরাধীশ')। তিনি ছিলেন পরাক্রান্ত রাজা ও সমুদ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদলের নেতা। চন্দ্রবর্মণ ছিলেন সুশুনিয়া (পশ্চিমবঙ্গ) রাজ্যের অধিপতি।

গঙ্গা-দোয়াব অঞ্চলে আধিপত্য সুদৃঢ় করার পর সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ে বাহির হন। এই পর্যায়ে যে সকল রাজা অথবা উপজাতি সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাস্ত হইয়া—তাঁহার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, উহাদের একটি তালিকা হরিষেণের প্রশস্তিতে পাওয়া যায়। এই তালিকায় রাজ্যগুলি অথবা উপজাতিগুলিকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে দক্ষিণ-ভারতের বারোটি রাজা ও রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আর্যাবর্তের নয়জন রাজার নাম পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্ত এই রাজাগুলি জয় করিয়া সরাসরি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। তৃতীয়

শ্রেণীভুক্ত ছিল মধ্য-ভারতের অরণ্যময় আটবিক রাজ্যের নৃপতিগণ, পাঁচটি প্রত্যন্ত রাজ্যের নৃপতিগণ এবং নয়টি উপজাতীয় প্রজাতন্ত্র। সমুদ্রগুপ্ত আটবিক নৃপতিগণকে পরিচারকে ('পরিচারকীকৃত') পরিণত করিয়াছিলেন। অন্যান্য নৃপতিগণকে করদানে বাধ্য করা হয়। চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন রাজ্য, যাহার নৃপতিগণ সমুদ্রগুপ্তের সন্তোষ-বিধানে সর্বদাই সচেষ্ট রহিতেন।* আর্যাবর্তের প্রায় সকল রাজ্যই গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া সমুদ্রগুপ্ত 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা' উপাধি গ্রহণ করেন।

(২) **দক্ষিণ-ভারত :** আর্যাবর্তে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়া সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ-ভারতের দিকে অগ্রসর হন। 'এলাহাবাদ-প্রশস্তি' হইতে জানা যায় যে, দক্ষিণ-ভারতে সমুদ্রগুপ্ত সে সকল রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কোশলের মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজা, কৌরলের মন্তরাজ, কোত্তুরের স্বামীদত্ত, এরণ্ডের দমন, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ, অভমুক্তার নীলরাজ, কুস্থলাপুরের ধনঞ্জয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-ভারতের এই অভিযান সামরিক দিক হইতে সাফল্যমণ্ডিত হইলেও সমুদ্রগুপ্ত বিজিত রাজ্যগুলিকে স্বরাজ্যভুক্ত না করিয়া বিজিত রাজন্যবর্গের নিকট হইতে আনুগত্যের শপথ লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। সম্ভবত সুদূর পাটলিপুত্র হইতে দক্ষিণ-ভারতের উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব নহে উপলব্ধি করিয়াই তিনি এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

দাক্ষিণাত্যের পরাজিত রাজন্যবর্গের প্রতি অনুসৃত নীতি : আর্যাবর্তের অনুসৃত নীতির সহিত ইহার পার্থক্য

(৩) **সীমান্ত রাজন্যবর্গের আনুগত্য লাভ :** সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ে আতঙ্কিত হইয়া পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের সীমান্ত অঞ্চলের, যথা—সমতাত, কামরূপ, নেপাল, মালব, অর্জুনায়ন, আভীর প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিগণ তাঁহার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া কর-প্রদানে সম্মত হন। এমন কি উত্তর-পশ্চিম ভারতের কুষাণ ও গুজরাটের শকরাজগণও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। সমতাত রাজ্যটি কামরূপের দক্ষিণে, কর্ণসুবর্ণের (আধুনিক মুর্শিদাবাদ) এবং তাম্রলিপ্তির (আধুনিক মেদিনীপুর জেলা) পূর্বে অবস্থিত ছিল। আধুনিককালের আসাম লইয়া কামরূপ রাজ্যটি গঠিত ছিল। সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক কামরূপ-রাজ ছিলেন পুষ্যবর্মণ, মতান্তরে সমুদ্রবর্মণ। তৎকালীন নেপাল-রাজ্যটি গণ্ডক ও কুশি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল। সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক নেপাল-রাজ ছিলেন প্রথম জয়দেব। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময় মালব-রাজ্যটি পাঞ্জাবের এক অংশ লইয়া গঠিত ছিল। সমুদ্রগুপ্তের আমলে এই রাজ্যের সুনির্দিষ্ট রাজ্যসীমা জানা যায় না। ডক্টর মজুমদারের মতে মালব-রাজ্যটি সম্ভবত মেবার, টোঙ্ক ও দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থানের কিছু অংশ লইয়া গঠিত ছিল। অর্জুনায়ন রাজ্যটি আগ্রা ও মথুরার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। আভীর-রাজ্যটি ঝাঁসী ও ভিলসার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।

* সুনীল চট্টোপাধ্যায় — প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পৃঃ—৪৯৪।

৮.৫ **বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক** (Foreign relations) : সমুদ্রগুপ্তের সামরিক খ্যাতি কেবলমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারত উপমহাদেশের বাহিরেও এই খ্যাতি বিস্তারলাভ করিয়াছিল। চৈনিক সূত্র হইতে জানা যায় যে, সিংহলের রাজা শ্রীমেঘবর্মণ বুদ্ধগয়ায় একটি বৌদ্ধ সংঘরাম প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি চাহিয়া সমুদ্রগুপ্তের নিকট প্রচুর উপঢৌকনসহ দূত পাঠাইয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের অনুমতিক্রমে উক্ত সংঘরামটি নির্মিত হয়। হিউয়েন-সাং এই সংঘরামটিকে 'মহাবোধি সংঘরাম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রায় এক হাজার মহাযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এই সংঘরামে বাস করিতেন। সমুদ্রগুপ্তের নিকট সিংহল-রাজের দূত পাঠাইবার কথা 'এলাহাবাদ-প্রশস্তি'তেও উল্লিখিত আছে।

সম্ভবত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের, যথা—মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা ও যবদ্বীপ প্রভৃতি হিন্দু উপনিবেশগুলির উপরও সমুদ্রগুপ্ত রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে বা পরে ভারতের কোন হিন্দু বা মুসলমান নৃপতি এই সকল উপনিবেশগুলির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারেন নাই।

অশ্বমেধ যজ্ঞ : দিগ্বিজয় সম্পন্ন করিয়া সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞের স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেন।

সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা : ডক্টর মজুমদারের (রমেশচন্দ্র) মতে কাশ্মীর, পশ্চিম-পাঞ্জাব, পশ্চিম-রাজপুতানা, সিন্ধু ও গুজরাট ভিন্ন প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ডক্টর মুখার্জীর (আর. কে.) মতে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে নর্মদা এবং উত্তরে হিমালয় ও কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্ভবত সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্তের যে অংশ প্রত্যক্ষভাবে শাসন করিতেন তাহা উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে নর্মদা, পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার বাহিরে ছিল স্বায়ত্তশাসিত করদ ও মিত্র রাজ্য। তাঁহার সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসনের সহিত স্বায়ত্তশাসনের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল।

সমুদ্রগুপ্তের ধর্ম : সমুদ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু অপর ধর্মের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থকার বসুবন্ধু ছিলেন তাঁহার মন্ত্রী।

৮.৬ **সমুদ্রগুপ্তের চরিত্র ও কৃতিত্ব** (Character and achievements) : মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর সমুদ্রগুপ্তই সমগ্র ভারতে এক সার্বভৌম রাজশক্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সামরিক অভিযানের ব্যাপকতা এবং রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের বিস্তৃতি লক্ষ্য করিয়াই স্মিথ তাঁহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি ভারতের সনাতন দিগ্বিজয় আদর্শের মূর্ত প্রতীক ছিলেন এবং দিগ্বিজয়ী রূপে তিনি বিশ্বের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরবৃন্দের অন্যতম।

ভারতের নেপোলিয়ন

সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি ভারতে এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছিলেন। তিনি এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন করিয়া ভারতে অভ্যন্তরীণ শান্তি

...করিয়াছিলেন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিদের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়াছিলেন। 'এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে' তাঁহাকে 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা' বা বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কারণেই সম্ভবত তিনি 'বিক্রমাংক' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। শান্তি ও ...হিংসার প্রতি অশোকের যেরূপ অনুরাগ ছিল, যুদ্ধ ও পররাজ্য গ্রাসের প্রতিও সমুদ্র-...গুপ্তের সেইরূপ আকর্ষণ ছিল।

...সামরিক প্রতিভার সহিত তিনি কূটনীতিজ্ঞানেরও পরিচয় দিয়াছিলেন। আর্যাবর্তে ...দিগ্বিজয়নীতি অনুসরণ করিয়া এই অঞ্চলের সকল রাজন্যবর্গকে পরাজিত ...তাঁহাদের রাজ্য স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-ভারতেও তিনি সামরিক সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের রাজন্যবর্গের প্রতি তিনি মিত্রতামূলক নীতি অবলম্বন করেন। কারণ দক্ষিণ-...বিজিত রাজ্যগুলির উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব নহে উপলব্ধি ...তিনি এই অঞ্চলের রাজন্যবর্গের আনুগত্য লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। ...সন্দেহ ইহা সমুদ্রগুপ্তের রাজনৈতিক বাস্তববুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। ...সীমান্ত রাজন্যবর্গের সম্পর্কেও তিনি এই নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের আনুগত্য ...লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সমুদ্রগুপ্ত পাঞ্জাব ও রাজস্থানের প্রজাতন্ত্র-শাসিত রাজ্যগুলির শক্তি বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরবর্তী গুপ্তরাজগণের ...আমলে ইহা ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রজাতন্ত্র-শাসিত রাজ্যগুলি বিধ্বস্ত ...হওয়ায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হূনদের আক্রমণের পথ সুগম হইয়াছিল। গুপ্তদের সহিত উপজাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলির সম্পর্ক ছিল অদ্ভুত ধরনের। লিচ্ছবীদের সহিত সম্পর্ক গুপ্তরাজগণ গৌরবজনক বলিয়া মনে করিতেন কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পশ্চিম সীমান্তের প্রজাতন্ত্র-শাসিত রাজ্যগুলি বিধ্বস্ত ...করিতে তাঁহারা মোটেই দ্বিধা করেন নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া পশ্চিম সীমান্তে ...বিদেশী আক্রমণ সত্ত্বেও প্রজাতান্ত্রিক ঐতিহ্য অব্যাহত থাকে। সমুদ্রগুপ্তের একাধিক ...অভিযানের ফলে প্রজাতান্ত্রিক পদ্ধতি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জাতি ও উপজাতির মধ্যে দীর্ঘ-...কালের সংগ্রামের অবসান ঘটে এবং উপজাতিদের উপর বর্ণ বা জাতির সাফল্য ঘটে।*

সমুদ্রগুপ্ত যে কেবলমাত্র দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন তাহা নহে, তিনি একাধারে ...বিদ্যোৎসাহী, সুকবি ও সুদক্ষ শাসক ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। বহুমুখী প্রতিভার ... তিনি ... 'এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে' তাঁহাকে 'কবিরাজ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ... কাব্য রচনা করিয়া সুধীসমাজে আদৃত হইয়াছিলেন। ... ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি বিদ্যা ও বিদ্বানদের পরম পৃষ্ঠপো... ...ছিলেন। তাঁহার প্রচারিত আট রকমের মুদ্রায় তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পরি...

Margin notes: সমগ্র ভারতীয় সাম্রাজ্য ...; ... সামরিক প্রতিভা; রাজনৈতিক দূরদর্শিতা; জাতি-উপজাতি সংগ্রামের অবসান; ...র বহুমুখী প্রতিভা

* রমিলা থাপার ... "... conflict of caste versus tribe had resulted in a vic...

তিনিই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ ভারতীয় মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় বৈদেশিক দেব-দেবীর কোন প্রতিচ্ছবি নাই, পরিবর্তে লক্ষ্মী, দুর্গা, সরস্বতী, গঙ্গা ইত্যাদি দেব-দেবীর মূর্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। এক কথায়, তাঁহার মুদ্রাগুলি, বৈদেশিক প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল এবং তাঁহার সর্বভারতীয় মনোভাব পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

শাসক হিসাবেও তিনি সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বৈদেশিক প্রভাব হইতে শাসনব্যবস্থাকে মুক্ত করিয়া প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় রাজকর্মচারীদের উপাধি, ক্ষমতা ও উহাদের পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুস্পষ্ট করা হইয়াছিল। উত্তর-ভারতে মুসলমানদের অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থা মোটামুটি ভাবে অব্যাহত ছিল।

ধর্মের দিক দিয়াও তিনি ছিলেন উদার। সিংহল-রাজ মেঘবর্মণকে বৌদ্ধগয়ায় বৌদ্ধমঠ নির্মাণের অনুমতি প্রদান ও বৌদ্ধপণ্ডিত বসুবন্ধুকে মন্ত্রী-পদে নিয়োগ করার ব্যাপারে তাঁহার পরধর্মসহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। বীর, বিদ্বান, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, বিদ্যোৎসাহী ও সুশাসক হিসাবে সমুদ্রগুপ্ত ভারতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন।

পরধর্মসহিষ্ণুতা

...চোল রাজাদের কৃতিত্ব।

❖ উত্তর ভারত ❖

❖ প্রশ্ন (১) : *হর্ষবর্ধনের 'কৃতিত্ব' নিরূপণ কর।*

[[redacted], '[redacted] ([redacted])]

■ **উত্তর :** হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর। পিতা প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধনের শশাঙ্ক ও মালবরাজ দেবগুপ্তের চক্রান্তে মৃত্যু হলে দায়িত্বভার হর্ষবর্ধনের উপর এসে পড়ে। ইতিমধ্যে কনৌজের রাজা এবং তাঁর ভগ্নিপতি গ্রহবর্মার মৃত্যু হয়।

সিংহাসনারোহণ

হর্ষবর্ধন সভাসদদের অনুরোধে **'যুবরাজ শিলাদিত্য'** উপাধি নিয়ে থানেশ্বর ও কনৌজের সিংহাসনে বসেন।* অল্প বয়সে রাজা হলেও হর্ষবর্ধন যথেষ্ট দূরদর্শী ছিলেন। হর্ষবর্ধনের সিংহাসনারোহণকাল থেকে **'হর্ষাব্দ'** গণনা করা হয়।

● **রাজ্যবিস্তার :** সিংহাসনে বসেই তিনি একে একে পাঞ্জাব, রাজপুতানা, গুজরাট এমনকি নর্মদা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলি জয় করেন। তবে **আর. কে. মুখার্জীর** মতে, কাশ্মীর তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল কিনা সন্দেহ আছে। পূর্বদিকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তবে শশাঙ্কের মৃত্যুর পরেই তাঁর এই বঙ্গবিজয় সফল হয়েছিল। ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কামরূপরাজ ভাস্করবর্মন ও হর্ষবর্ধন গৌড়কে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। মালবরাজ দেবগুপ্তের হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শত্রুতার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই মালব রাজ্যটি হর্ষের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। গুজরাটের বলভী রাজ্যের রাজা ধ্রুব সেনকেও পরাজিত করে তিনি গুজরাট জয় করেন। সমগ্র উত্তর ভারত বা আর্যাবর্ত জুড়ে হর্ষবর্ধন সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। পরে বল্লভী ও থানেশ্বর রাজ্যের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

হর্ষবর্ধন

'পঞ্চভারতের' অর্থাৎ **পাঞ্জাব, কনৌজ (উত্তরপ্রদেশ), বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলা তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল।** ঐতিহাসিক **কে. এম. পানিক্করের** মতে, কাশ্মীর ও নেপাল তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ("Nepal and Kashmir were also within his empire....has authority north of the Vindhyas as was complete." ঐতিহাসিকরা একথা স্বীকার করেন না।

এরপর হর্ষবর্ধন দাক্ষিণাত্য বিজয়ে অগ্রসর হন (৬৩৪ খ্রীঃ)। কিন্তু **চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাস্ত হয়ে তিনি সে আশা ত্যাগ করেন। রবিকীর্তির 'আইহোল প্রশস্তি'তে একথা লেখা আছে।** হর্ষবর্ধন রাজ্যজয়ের পর **'সকলোত্তরপথনাথ'** ও **'উত্তরাপথনাথ'** উপাধি দুটি গ্রহণ করেছিলেন।

---

* "He was in short a great warrior in camp, a statesman at court, a poet in his palace and a devotee in the temple, a refined diplomat and a respected despot ; he was a worthy successor to the glories of the Mauryas and the grandeur of the Guptas"—*Smith.*

● **রাজ্যসীমা :** মোটামুটি উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী এবং পশ্চিমে কাথিয়াওয়ার (বলভী) থেকে পূর্বে ওড়িশার কঙ্গোদ (গঞ্জাম) পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।*

● **শাসনব্যবস্থা :** হর্ষবর্ধন রাজ্যবিজেতাই ছিলেন না, সুশাসনও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অশোকের পর হর্ষবর্ধনই একমাত্র প্রজাহিতৈষী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। **হিউয়েন সাঙ্**-এর বিবরণী অনুযায়ী হর্ষবর্ধন প্রজাদের মঙ্গলের প্রতি সজাগ থাকতেন। অশোকের মত প্রজাদের সুবিধার্থে তিনিও **সরাইখানা, বিশ্রামাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়** প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন।

● **রাজকর্তব্যের আদর্শ :** সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে শাসনকার্য সম্পর্কে অবহিত থাকার তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। জনসাধারণের সুখ-সুবিধা ও রাজকর্মচারীদের কর্তব্যপালন সম্পর্কে অবহিত থাকতে যত্নবান ছিলেন। রাজ্যভ্রমণকালে তিনি এগুলি ব্যক্তিগতভাবে তদন্তও করতেন।

● **মন্ত্রিপরিষদ ও রাজকর্মচারী :** হর্ষবর্ধন শাসনকার্যে রাজার ব্যক্তিপ্রাধান্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি শাসনব্যবস্থার মূল হলেও একটি মন্ত্রিপরিষদ ও অন্য রাজকর্মচারীদের পরামর্শমত সাম্রাজ্য পরিচালিত হত। মন্ত্রিপরিষদ রাজা নির্বাচন করতেন। তিনি **সিংহনাদ, কুমারমাতা** প্রভৃতি নামে রাজকর্মচারীও নিয়োগ করেছিলেন।

● **সাম্রাজ্য বিভাগ :** মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের মত হর্ষবর্ধনের **সাম্রাজ্যও কয়েকটি প্রদেশে বা 'ভুক্তি'তে বিভক্ত ছিল। ভুক্তিগুলি কয়েকটি 'বিষয়' ও বিষয়গুলি 'গ্রামে' বিভক্ত ছিল।**

● **সামরিক বিভাগ :** হর্ষবর্ধন সামরিক বিভাগেও সংস্কারসাধন করেছিলেন। তাঁর সামরিক বাহিনী চারভাগে বিভক্ত ছিল—**পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ ও হস্তী**। তবে অশ্বারোহীর সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত বেশি। সাধারণ সেনারা **'বড়'** ও **'ভট'** নামে পরিচিত ছিল। সৈন্যদেরস কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে হত। **১,০০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী ও ৬০,০০০ হস্তী তাঁর সেনাবাহিনীতে ছিল।**

● **বিচার ব্যবস্থা :** হর্ষবর্ধনের সময়ে বিচারব্যবস্থা ছিল নিরপেক্ষ। অপরাধীর শাস্তিস্বরূপ অঙ্গচ্ছেদ, কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড প্রভৃতি প্রচলন ছিল। তবে অপরাধের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

● **রাজস্ব ব্যবস্থা :** হর্ষবর্ধনের রাজস্ব তিনভাগে ভাগ করা যায়—**'বলি'**, **'ভাগ'**, ও **'হিরণ্য'**। বলি ও ভাগ ছিল কৃষিসংক্রান্ত রাজস্ব। ১/৫ বা ১/৬ অংশ শস্য কর রূপে গৃহীত হত। কৃষক ও বণিকদের জন্য 'হিরণ্য' নামক আরেক প্রকার কর প্রচলিত ছিল। হিউয়েন সাঙের মতে, এই করপ্রথা ছিল উদার। রাজস্বের হার কম থাকায় সাধারণ মানুষের জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল।

● **ধর্মসহিষ্ণুতার নীতি :** হর্ষবর্ধনের সময় বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় হয়েছিল। হর্ষবর্ধন প্রথমে শৈব ও সূর্যোপাসক ছিলেন। পরে বৌদ্ধ ধর্মে আকৃষ্ট হয়েও তিনি অন্যান্য ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাবান ছিলেন।

● **ধর্মমহাসম্মেলন : ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজের ধর্মমহাসম্মেলনে হিউয়েন সাঙ্ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।** তাঁর বিবরণী **'সি-ইউ-কি'** থেকে জানা গেছে যে, এই ধর্মসম্মেলন ছিল প্রাচীন ভারতের সব থেকে বড় ধর্মসম্মেলন। ৪,০০০ **বৌদ্ধ, ৩,০০০ জৈন ছাড়াও পারসিক, হিন্দু ও অন্য ধর্মের মানুষও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। হিউয়েন সাঙ্ মহাযানপন্থার ব্যাখ্যা করেছিলেন এই সম্মেলনে।**

---

* "The emperor's army had overrun almost the whole of Northern India from the snowy mountains of the north to the Narmudda in the south, and from Ganjum in the east to Valabi in the west."—**Advanced History of India**

● **প্রয়াগের দান মেলা :** হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ ধর্মাসক্ত হলেও পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি প্রয়াগে কুম্ভমেলার আয়োজন করেছিলেন। এই মেলায় এক সঙ্গে **সূর্য, শিব ও বিষ্ণুর উপাসনা করা** হত। প্রয়াগের **গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে** 'মহামোক্ষ রিষদ' নামক **এই হিন্দু মেলায় তাঁর চারিত্রিক উদারতার সর্বোৎকৃষ্ট পরিচয় মেলে** 'দানক্ষেত্র' ও 'সন্তোষক্ষেত্র' গঠনের মধ্যে। **পঞ্চবার্ষিকী এই মেলায় তিনি পাঁচ বছরের সঞ্চিত রাজকোষের সব অর্থ দীন-দরিদ্রকে বিতরণ করতেন।**

● **সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতা :** হর্ষবর্ধনের শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তাঁর সভাকবি বাণভট্ট রচিত **'হর্ষচরিত'** ও **'কাদম্বরী'** উল্লেখযোগ্য। মৌর্য কবি **ভর্তৃহরি, মাতঙ্গ, দিবাকর, জয়সিংহও** তাঁর সভা অলঙ্কৃত করতেন। হর্ষবর্ধন নিজেই **'নাগানন্দ'**, **'প্রিয়দর্শিকা'** ও **'রত্নাবলী'** নামে নাটক রচনা করে উৎকর্ষের পরিচয় দেন। **হর্ষের কলম অস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী বলে ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী মনে করেন।** ("Harsha seems to have wielded his pen with no less dexterity than the sword."—Amalesh Tripathi) সেই সময় সংস্কৃত সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। রাজস্বের এক বিশাল অংশ সাহিত্যসেবার জন্য ব্যয়িত হত। গান্ধার শিল্প স্থাপত্যের ক্ষেত্রে কনৌজ ও থানেশ্বরের প্রাসাদ ও অট্টালিকা বিশেষ উন্নতির পরিচায়ক ছিল।

● **বিদ্যোৎসাহিতা :** হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতায় সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়েছিল **নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়**। তখন **নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন মহাস্থবির শীলভদ্র।** দেশবিদেশের ছাত্ররা এখানে অধ্যয়ন করতে আসত। সমসাময়িক প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশীলারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি।

পরিশেষে বলা যায়, সপ্তম শতকের উত্তর ভারতের ইতিহাসে হর্ষবর্ধন একটি স্মরণীয় নাম। গুপ্তযুগের পর রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা, সুশাসন, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে হর্ষবর্ধন অভূতপূর্ব অবদান রেখেছিলেন। শুধু সুশাসক নয়, মানুষরূপেও হর্ষবর্ধন ছিলেন উদার, পরধর্মমতসহিষ্ণু, ন্যায়নিষ্ঠ, চরিত্রবান, গুণগ্রাহী, দানশীল। এই গুণগুলির সাথে পিতৃভক্তি, জ্যেষ্ঠভ্রাতৃভক্তি ও ভগিনীপ্রীতি তাঁর চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে।

মূল্যায়ন

ডঃ আর. কে. মুখার্জীর মতে, 'অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের চারিত্রিক গুণাবলীর অপূর্ব সমাবেশ হর্ষবর্ধন চরিত্রে দেখা যায়। হর্ষের সভাকবি বানভট্ট লিখেছেন, "**তূণ হরিণের কাছে তিনি ছিলেন সিংহের মত, সিন্ধু অঞ্চলের রাজার কাছে তপ্তজ্বরের, গুজরাটের নিদ্রায় ব্যাঘাতকারী, গজহস্তী গান্ধারপতির কাছে ভীষণ ব্যাধির মত, ন্যায়নীতিহীন লাটদের কাছে দস্যুর মত এবং মালবের গৌরবলতার কাছে কুঠারের মত।**" (বানভট্টের লেখা 'হর্ষচরিত' থেকে উদ্ধৃত)

❖ **প্রশ্ন** (২) : *ত্রি-পাক্ষিক দ্বন্দ্বের উৎপত্তির কারণ এবং ফলাফল/গুরুত্ব বর্ণনা কর।*

■ **উত্তর :** ৬৪৭ খ্রীঃ অপুত্রক রাজা হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর কনৌজের সিংহাসনের উপর আধিপত্য স্থাপনকে কেন্দ্র করে **পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের** মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, তাকে **'ত্রি-পাক্ষিক দ্বন্দ্ব'** বা **'ত্রি-শক্তির সংগ্রাম'** (Tripartite Struggle) বলে। এই রাজনৈতিক অনৈক্যের যুগে বহু আঞ্চলিক রাজবংশ ও স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। তার মধ্যে পশ্চিম ভারতের **মালব ও রাজপুতানার গুর্জর-প্রতিহার বংশ** (**'প্রতিহার'** কথার অর্থ দুয়ার রক্ষাকারী), পূর্ব দিকে **বাংলার পালবংশ** এবং দক্ষিণ ভারতে **মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রকূট বংশ** সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠে। বিশেষ করে রাজপুত জাতির উত্থান এই যুগের সবচেয়ে বড় ঘটনা। মোট ৩৬টি গোষ্ঠীর কোন না কোন রাজপুত বংশ নিজ-নিজ এলাকায় বিশেষ

বিভিন্ন গোষ্ঠীর উৎপত্তি

প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। এইসব বংশের মধ্যে মালবের **প্রতিহার বংশ**, কনৌজের **গাহড়বাল বংশ**, আজমীর ও দিল্লীর **চৌহান বংশ**, গুজরাটের **শোলাঙ্কি বংশ**, চেদীর **কলচুরি বংশ** ও বন্দেলখণ্ডের **চান্দেল্ল বংশ** প্রধান।

● **ত্রি-শক্তির দ্বন্দ্বের কারণ :** হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর প্রায় একশ বছর ধরে উত্তর ভারতে রাজনৈতিক অরাজকতা চলেছিল। কনৌজ ছিল ভারতের প্রাণকেন্দ্র, অথচ যোগ্য উত্তরাধিকারের অভাবে কনৌজ ও থানেশ্বরের সিংহাসনে কেউ বসতে পারেন নি। ফলে এই অন্ধকারময় রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগে প্রতিবেশী আঞ্চলিক রাজ্যগুলি কনৌজের সিংহাসন লাভের জন্য পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। **প্রথমে প্রতিহার ও পাল রাজারা এই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। তারপর রাষ্ট্রকূট শক্তি সেই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যায়।**

দ্বন্দ্বের উৎপত্তি

হর্ষের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতের রাজনৈতিক শূন্যতা (Political vacume) ঢাকতে পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট শক্তির সক্রিয় ভূমিকালাভের পিছনে বেশ কিছু কারণ ছিল। প্রথমতঃ হর্ষবর্ধনের সময় কনৌজকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তার একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার জন্য পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটশক্তি দ্বন্দ্বে মেতে ওঠে। **দ্বিতীয়তঃ** খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে আঞ্চলিক শক্তিগুলি কনৌজের উপর আধিপত্য স্থাপন করে হর্ষের মত মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আশায় পারস্পরিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে। **তৃতীয়তঃ** কনৌজের ভৌগোলিক ক্ষেত্রে অনুকূল অবস্থান প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে প্রলুব্ধ করেছিল। এখানকার উর্বর বিস্তীর্ণ গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের বাসনা দ্বন্দ্বের আর একটি কারণ। **চতুর্থতঃ** কনৌজ একটি বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। এর সংলগ্ন এলাকাগুলিও বেশ সমৃদ্ধশালী।

দ্বন্দ্বের কারণ

● সুতরাং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে কনৌজের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আর সেই জন্যই পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব মূলতঃ কনৌজকে কেন্দ্র করে তীব্ররূপ লাভ করেছিল। অষ্টম-নবম শতকের ভারতের মধ্যমণি কনৌজ-এর গুরুত্বপ্রসঙ্গে জনৈক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন, **"পশ্চিম এশিয়ার যোদ্ধা জাতিগুলির কাছে যেমন ছিল ব্যাবিলন, টিউটন নামক বর্বরজাতির কাছে যেমন ছিল রোম আকর্ষণের বস্তু, ঠিক তেমনি অষ্টম-নবম শতকের রাজ-বংশগুলির কাছে কনৌজ বা 'মহোদয়াশ্রীর' উপর আধিপত্য স্থাপন ছিল মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব লাভের মানদণ্ড।"**

কনৌজকে কেন্দ্র করে বিবাদের কারণ

● **ত্রি-পাক্ষিক দ্বন্দ্বের বিবরণ :** ত্রি-শক্তির দ্বন্দ্বের প্রথম পর্বে প্রতিহারবংশীয় **বৎসরাজ (৭৭৫-৮০০ খ্রীঃ)** মধ্য-এশিয়া ও রাজপুতানা দখলের পর ৭৮৩ খ্রীঃ **'দোয়াবের যুদ্ধে'** পাল রাজার **ধর্মপালকে (৭৭০-৮১০ খ্রীঃ)** পরাস্ত করেন। কিন্তু সেই সময় রাষ্ট্রকূটরাজ **ধ্রুব (৭৭৯-৭৯৩ খ্রীঃ)** প্রথমে বৎসরাজ ও পরে ধর্মপালকে পরাস্ত করে নিজের অনুগত কনৌজবাসী ইন্দ্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে পুনঃপ্রবর্তন করে দক্ষিণ ভারতে ফিরে যান। বৎসরাজও সর্বহারা হয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে আসেন। **'খালিমপুর তাম্রলিপি'**, **'মুঙ্গের শিলালিপি'** এবং নারায়ণ পালের **'ভাগলপুর তাম্রলিপি'** থেকে জানা যায়, রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহার তখন সামরিক দিক থেকে শক্তিহীন হয়ে পড়লে, সেই সুযোগে ধর্মপাল তাঁর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করে কনৌজ পর্যন্ত পাল সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। এইসময় কনৌজের রাজা **ইন্দ্রায়ুধকে সিংহাসনচ্যুত করে ধর্মপাল নিজের অনুগত এক সামন্ত কর্মী চক্রায়ুধকে** কনৌজের সিংহাসনে বসান।

প্রথম পর্বের দ্বন্দ্ব

● দ্বিতীয় পর্বের দ্বন্দ্ব ঠিক আগের মত। প্রতিহাররাজ **দ্বিতীয় নাগভট্ট (৮০০-৮২৫ খ্রীঃ)** **'কনৌজের যুদ্ধে'** চক্রায়ুধকে এবং **'মুঙ্গেরের যুদ্ধে'** ধর্মপালকে পরাস্ত করে, তাঁর **রাজধানী**

উজ্জয়িনী থেকে কনৌজে স্থানান্তরিত করেন। পরাজিত হয়ে ধর্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের পুত্র **তৃতীয় গোবিন্দের (৭৯৩-৮১৪ খ্রীঃ)** কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। সম্ভবতঃ সেই কারণেই তৃতীয় গোবিন্দ তাঁর বল্লমধারী সেনাবাহিনী নিয়ে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে হাজির হন। তারপর প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাস্ত করে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু রাষ্ট্রকূট পরিবারে অন্তর্কলহের খবর পেয়ে তৃতীয় গোবিন্দ এই বিজয়ের সুফল ত্যাগ করে দক্ষিণে ফিরে গেলে ধর্মপাল হৃত গৌরব আবার পুনঃরুদ্ধার করেন। **ডঃ আর. সি. মজুমদার** বলেন, শক্তিশূন্যতার সুযোগে ধর্মপাল ক্ষমতাবৃদ্ধি করলেও একমাত্র বাংলা ও বিহার ছাড়া অন্যকোথাও প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তন করতে পারেননি।

দ্বিতীয় পর্বের দ্বন্দ্ব

গুর্জর-প্রতিহার	*রাষ্ট্রকূট*	*পাল*
বৎসরাজ (৭৮৬ খ্রীঃ)	ধ্রুব (৭৭৯-৭৯৩ খ্রীঃ)	ধর্মপাল (৭৮০-৮১৫ খ্রীঃ)
নাগভট্ট (৮১৫ খ্রীঃ)	তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৪-৮১৩ খ্রীঃ)	দেবপাল (৮১৫-৮৫৫ খ্রীঃ)
রামভদ্র	অমোঘবর্ষ (৮১৪-৮৭৭ খ্রীঃ)	বিগ্রহপাল (৮৫৫-৮৬০ খ্রীঃ)
ভোজ (৮৩৬-৮৮৫ খ্রীঃ)		
মহেন্দ্রপাল (৮৮৫-৯১০ খ্রীঃ)	দ্বিতীয় কৃষ্ণ (৮৭৮-৯১৪ খ্রীঃ)	নারায়ণ পাল (৮৬০-৯১৫ খ্রীঃ)

[তিনটি পক্ষ]

তথ্যসূত্র : Ancient India (Page 283) By *Dr. Ramesh Chandra Majumder*

● তৃতীয় পর্বে ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (৮১০-৮৫০ খ্রীঃ) প্রথমে প্রতিহাররাজ **রামভদ্র ও মিহিরভোজকে** পরাজিত করেন। তারপর প্রতিহাররাজ **প্রথমভোজ (৮৩৬-৮৮৫ খ্রীঃ)** বুন্দেলখণ্ড, যোধপুর, কালিবঙ্গান ও ত্রিপুরীর চেদীরাজ্য জয় করে কনৌজের দিকে অগ্রসর হলে দেবপাল তাঁকে বাধা দেন। ফলে ভোজরাজ পশ্চিম দিকে ফিরে গিয়ে আরবদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেন। দেবপাল রাষ্ট্রকূটরাজ **প্রথম অমোঘবর্ষকে-ও** পরাজিত করে নিজের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

তৃতীয় পর্বের দ্বন্দ্ব

● শেষ পর্বে দেবপালের মৃত্যুর পর পালসাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রতিহাররাজ **মিহিরভোজ** কনৌজ দখল করেন। প্রতিহাররাজ **মহেন্দ্রপাল (৮৮৫-৯১০ খ্রীঃ)** বাংলা ও বিহার দখল করলে পালদের শক্তি ও প্রতিপত্তি প্রায় নিঃশেষ হয়। **এদিকে ৮৬০ খ্রীঃ রাষ্ট্রকূটদের হাতে পালরাজ নারায়ণপালের (৮৫৪-৯০৮ খ্রীঃ) চরম পরাজয় ঘটে।** রাষ্ট্রকূটরাজ **দ্বিতীয় কৃষ্ণের (৮৭৮-৯১৪ খ্রীঃ)** সঙ্গে প্রতিহাররাজ ভোজরাজের দ্বন্দ্বের তখন নিষ্পত্তি হয়নি। দ্বিতীয় কৃষ্ণের পর তাঁর পুত্র **তৃতীয় ইন্দ্র (৯১৪-৯২২ খ্রীঃ)** প্রতিহাররাজ মহেন্দ্রপাল বা মহীপালকে (৯১২-৯৪৪ খ্রীঃ) ৯১৬ খ্রীঃ পরাস্ত করে কনৌজ দখল করেন। ক্রমশঃ প্রতিহাররা দুর্বল হয়ে নিশ্চিহ্ন হন। তারপর ভারতে তুর্কি আক্রমণ শুরু হয়। এই প্রতিহাররা প্রাচীন ভারতের সর্বশেষ হিন্দুজাতি যাঁরা ২০০ বছর ধরে মুসলিম আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করেছিলেন।

ত্রিশক্তির দ্বন্দ্বের শেষ পর্ব

ত্রিশক্তির দ্বন্দ্বের ফলাফল ও গুরুত্ব : প্রায় দু'শ বছর ধরে ত্রি-শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এত দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব খুব কম। এই দ্বন্দ্বের ফলাফল বিচারে গুরুত্বও অনেক বেশি। **প্রথমতঃ** এই দীর্ঘ দ্বন্দ্বে তিনটি পক্ষের প্রত্যেকের যুদ্ধজনিত কারণে প্রচুর আর্থিক

ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। **দ্বিতীয়তঃ** দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলতে থাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলির প্রত্যেকের সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে তুর্কীরা অনায়াসে ভারত আক্রমণ করতে পেরেছিল। **তৃতীয়তঃ** ত্রি-শক্তির দ্বন্দ্বের ফলে রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়। ফলে দ্বন্দ্বোত্তর যুগের ভারতের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াল ক্ষুদ্র আঞ্চলিকতাবাদের উত্থান।

দ্বন্দ্বের ফলাফল পুরোপুরি বিপর্যয়কর

চতুর্থতঃ পাল-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট শক্তির মধ্যে হর্যোত্তর যুগে সার্বভৌম রাজশক্তি ও অখণ্ড সাম্রাজ্য গঠনের যে চেষ্টা শুরু হয় তা ফলপ্রসু হয়নি। কারণ কোন শক্তি কিছুটা ঐক্যবদ্ধ হলেও আবার ভেঙে পড়েছিল। স্থায়ী কোন সাম্রাজ্য বা সংহতি আর্যাবর্তে গড়ে ওঠেনি। বরং চৌহান, চান্দেল্ল প্রভৃতি শক্তির বিকাশ ঘটে।

তাই খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষার্ধ থেকে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত যে ত্রি-শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছিল, তাকে কোন কোন ঐতিহাসিক ইতিহাসের **'ব্যর্থ সংগ্রাম'** বলেছেন। কারণ কেউ এর দ্বারা লাভবান হয়নি।

স্মৃতিচর্চার এক উন্নত বাতাবরণ তৈরী করেছিলেন।

❖ প্রশ্ন (৪) : *বাংলার পাল রাজাদের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।* [[redacted]]

■ **উত্তর :** শশাঙ্কের মৃত্যুর পর (৬৩৭ খ্রীঃ) বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক অরাজকতা বনাম মাৎস্যন্যায় দেখা দেয়, তার অবসান ঘটিয়ে গোপাল নামে এক জনৈক ব্যক্তি রাজনৈতিক শান্তি স্থাপন করেন। তাই ভাগ্যান্বেষী পালরাজাদের উত্থান বংলার ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা।

● **গোপাল (৭৫০-৭৭০ খ্রীঃ) :** বাংলার "প্রকৃতিপুঞ্জের" অনুরোধে গোপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। জাতিতে ক্ষত্রিয় হলেও কোন রাজবংশজাত ছিলেন কিনা সন্দেহ আছে। গোপালের পিতার **নাম বপ্যাট ও পিতামহ দয়িতবিষ্ণুর** বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে গোপালের স্ত্রী **দেদ্দাদেবী** ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের রাজকন্যা। লামা তারানাথ পালদের ক্ষত্রিয় বললেও **'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে'** পালদেরকে **"দাসজীবিণঃ"** বা দাসবংশীয় শূদ্র বলা হয়েছে। কিন্তু **সন্ধ্যাকর নন্দী** পালদের সমুদ্র-কুলোদ্ভব বা সমুদ্র থেকে উদ্ভূত বলেছেন। পরে বরেন্দ্রভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। **ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার** এই মতকে স্বীকার করেছেন।

আদি পরিচয়

● গোপাল কুড়ি বছর রাজত্ব করেছিলেন। এই সময়কালের মধ্যে তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে বাংলার রাজনীতিতে ঐক্য ও সংহতি এনেছিলেন। **মুঙ্গের লিপি** থেকে জানা যায়, গোপাল সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল স্বৈরাচারী ও "কামাকারী" (অরাজকের স্রষ্টা)-দের হাত থেকে বাংলাকে বাঁচিয়েছিলেন। খালিমপুর লিপি থেকে জানা যায়, ৭৭০ খ্রীঃ মৃত্যুর আগে গোপাল বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে **"পরম সৌগত"** উপাধি নিয়েছিলেন।

কৃতিত্ব

● **ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রীঃ) :** গোপালের মৃত্যুর পর (৭৭০ খ্রীঃ) তাঁর সুযোগ্য পুত্র ধর্মপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। গুজরাটী কবি **সোঢ্‌ঢলের "উদয় সুন্দরী"** কথাকাব্যে ধর্মপালের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে **"উত্তরাপথস্বামীন"** বলা হয়েছে।

ত্রি-শক্তির দ্বন্দ্বের যুগে ধর্মপাল প্রতিহাররাজ, বৎসরাজ ও দ্বিতীয় নাগভট্ট এবং রাষ্ট্রকূট রাজ ধ্রুব ও তৃতীয় গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হননি ঠিকই, কিন্তু ভাগ্যগুণে কনৌজ ও

গাঙ্গেয় উপত্যকার এক বিস্তীর্ণ স্থান দখল করেন। রাষ্ট্রকূট রাজা দক্ষিণে ফিরে গেলে ধর্মপাল কনৌজের সিংহাসন থেকে **ইন্দ্রায়ুধকে** অপসারিত করে নিজের অনুগত সামন্তকর্মী **চক্রায়ুধকে** কনৌজের শাসনভার দেন। ধর্মপাল কনৌজ অতিক্রম করে হিমালয়-এর **কেদারতীর্থ** (গাড়োয়াল) থেকে **গোকর্ণ** (নেপাল) পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। খালিমপুর তাম্রলিপি থেকে জানা যায়, সমগ্র উত্তর ভারত জয়ের পর কনৌজে আয়োজিত এক দরবারে উত্তর ভারতের বহু সামন্তরাজা ধর্মপালের প্রতি বশ্যতা জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে (১) **ভোজ** (বেরার), (২) **মৎস্য** (জয়পুর ও আলওয়াল), (৩) **মদ্র** (মধ্য পাঞ্জাব), (৪) **কুরু**, (পূর্ব পাঞ্জাব ও থানেশ্বর), (৫) **কীর** (পাঞ্জাবের কাংড়া অঞ্চল), (৬) **যবন** (সিন্ধুর মুসলিম রাজ্য), (৭) **যদু** (সৌরাষ্ট্র অঞ্চল), (৮) **গান্ধার** (পূর্ব পাঞ্জাব), (৯) **অবন্তী** (রাজপুতানা), প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজ্যজয়

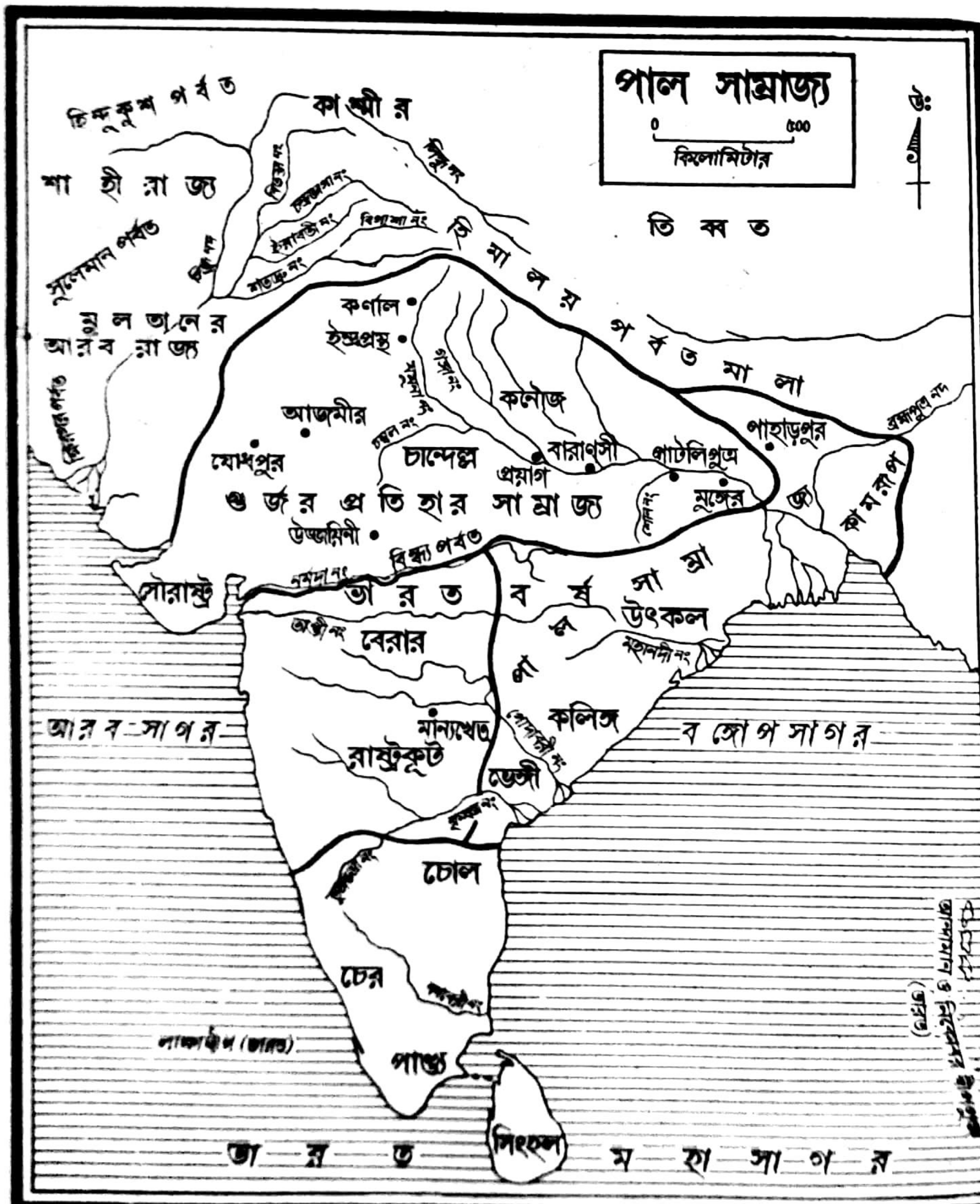

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, উত্তর ভারতের এক বিশাল সাম্রাজ্যের উপর ধর্মপাল আধিপত্য স্থাপন করলেও একমাত্র বাংলা ও বিহারে তিনি প্রত্যক্ষ শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। সার্বভৌম

শক্তির প্রতীক হিসাবে ধর্মপাল **"পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ"** উপাধি নিয়েছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে তাঁর কন্যা **রন্নাদেবীকে** বিবাহ করে ধর্মপাল কূটনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে তাঁর সাফল্যের পিছনে তাঁর ভাই **বাক্‌পাল** ও ব্রাহ্মণমন্ত্রী **গর্গভট্টের** অবদান অপরিসীম। ধর্মপালের গুরু বৌদ্ধ পণ্ডিত **হরিভদ্র** তাঁকে বৌদ্ধধর্মে অনুরাগী করে তুলেছিলেন। তাই ধর্মপাল বিক্রমশীলা মহাবিহার, সোমপুরী বিহার ও ওদন্তপুরী বিহার নির্মাণ করে বৌদ্ধ সংস্কৃতিচর্চার পথ প্রশস্ত রেখেছিলেন। সাহিত্য, চর্যাপদ, শিল্প-স্থাপত্য, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদির উন্নতির মাধ্যমে বাংলার জাতীয় জীবনে নতুন সূর্যোদয় ঘটিয়েছিলেন। তাই **ডঃ আর. সি. মজুমদার "ধর্মপালের রাজত্বকে বাঙালী জীবনের সুপ্রভাত"** বলে সঠিক মূল্যায়ন করেছেন।

অন্যান্য কৃতিত্ব

● **দেবপাল (৮১০-৮৫০ খ্রীঃ) :** ধর্মপালের পুত্র দেবপাল ৮১০ খ্রীঃ বাংলার সিংহাসনে বসেন। পিতার ন্যায় তিনিও ৪০ বছর রাজত্ব করেন (৮৫০ খ্রীঃ)। একজন রণনিপুণ বীর যোদ্ধা হিসাবে দেবপাল **"রক্ত ও লৌহ নীতি"** (Blood and Iron Policy) প্রয়োগ করে বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন।

'বাদল প্রশস্তি' ও **'হরগৌরী স্তম্ভ লিপি'তে** উল্লেখ আছে, উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত ও পূর্বে আসামের শেষপ্রান্ত থেকে পশ্চিমে সমুদ্রতীর পর্যন্ত অঞ্চল দেবপালের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। দেবপালের **মন্ত্রী দর্ভপাণি** ও **কেদারমিশ্রের** কূট পরামর্শে তিনি অতি সহজেই **প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর** (আসাম) ও **উৎকল** (উড়িষ্যা) নিজের করদরাজ্যে পরিণত করেছিলেন। কেদার মিশ্রের পুত্র গুরব মিশ্রের লিপি থেকে জানা যায়, **হূণ, গুর্জর, দ্রাবিড়** ও **কম্বোজদের** পরাস্ত করে দেবপাল সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠেন। **ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্বের সময়** প্রতিহাররাজ **প্রথম ভোজ** ও রাষ্ট্রকূটরাজ **প্রথম অমোঘবর্ষকে** তিনি পরাজিত করেছিলেন, পাণ্ড্যরাজ্যের দ্রাবিড় রাজা **শ্রীমার-শ্রীবল্লভকেও** দেবপাল পরাস্ত করেছিলেন। **ডঃ মজুমদারের** মতে এইভাবে বিন্ধ্যর দক্ষিণে **কর্ণাটক** ও পাণ্ড্যরাজ্য দেবপাল জয় করলেও পিতার নীতি মেনে ঐসব রাজ্যের স্বাধীনতা পুরোপুরি হরণ করেননি।

রাজ্যজয়

● ভারতের বাইরে যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি দ্বীপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সুমাত্রার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা **বালপুত্রদেব** দেবপালের অনুমতিক্রমে পাঁচটি গ্রাম নিয়ে নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেছিলেন। আরবীয় পর্যটক **সুলেমান** দেবপালের সৈন্যবাহিনীর উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। তবে তাঁর সংস্কৃতিবোধেরও ঘাটতি ছিল না। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে তিনি প্রচুর অর্থও ব্যয় করেছিলেন। **ডঃ আর. সি. মজুমদার** বলেছেন, **"ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা মহান যুগ।"**

বিদেশনীতি

৮৫০ খ্রীঃ দেবপালের মৃত্যুর পর **প্রথম বিগ্রহপাল** (৮৫০-৮৫৪ খ্রীঃ), **নারায়ণপাল** (৮৫৪-৯০৮ খ্রীঃ), **রাজ্যপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল** একে একে বাংলার সিংহাসনে বসেছিলেন। এঁদের রাজত্বকালে ক্রমাগত উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের সুযোগে প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট, কলচুরি, কম্বোজ ও চান্দেল্লদের আক্রমণে পালদের কেন্দ্রীয় রাজশক্তি মগধের সংকীর্ণ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এইসময় পালদের সামগ্রিক জীবনে চরম দুর্দিন ঘনিয়ে আসে।

রাজনৈতিক বিপর্যয়

● **প্রথম মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮ খ্রীঃ) :** এই দুর্দিনে **প্রথম মহীপাল** শক্ত হাতে হাল ধরে পাল সাম্রাজ্যের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তিনি **কম্বোজ** ও **চন্দ্রদের** কাছ থেকে **উত্তরবঙ্গ পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের** কিছু অংশ এবং **উত্তর ও দক্ষিণ বিহার** পুনরুদ্ধার করেন। **বারাণসী** ও **সারনাথ** পর্যন্ত নিজের ক্ষমতাবৃদ্ধি করেন। তাঁর রাজত্বকালে **প্রথম রাজেন্দ্র চোল** বাংলা আক্রমণ

করলেও (১০২১-২৩ খ্রীঃ) কোন স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেননি। তবে ১০২৬ খ্রীঃ গাঙ্গেয়দেব কলচুরির আক্রমণে প্রথম মহীপাল পরাস্ত হন। কিন্তু মহীপালের অসামান্য সামরিক দক্ষতার গুণে পাল সাম্রাজ্য পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল বলে তাঁকে **"দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা"** বলা হয়। মহীপাল কাশীর হিন্দুমন্দির এবং সারনাথ ও নালন্দার বৌদ্ধমঠদুটি নির্মাণ করান। এছাড়া তিনি বহু পুষ্করিণী খনন ও শহর নির্মাণ করেছিলেন। **ডঃ আর. সি. মজুমদার** তাঁর **'বাংলার ইতিহাস'** গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, "মোটের উপর মহীপালের রাজ্যে বাংলার সকল দিকেই এক নতুন জাতীয় জাগরণের আভাস পাওয়া যায়।"

কৃতিত্ব

● **দ্বিতীয় মহীপাল :** প্রথম মহীপালের রাজত্বকালে, তাঁর পৌত্র **দ্বিতীয় মহীপালের** রাজত্বকালের কিছু আগে **কলচুরিরাজ লক্ষ্মীকর্ণ, উড়িষ্যার রাজা মহাশিবগুপ্ত যযাতি** ও **চালুক্যরাজ প্রথম সোমেশ্বরের** বাংলা আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। তার উপর দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমিতে **ভীম** ও **দিব্য** বা **দিব্যকের** নেতৃত্বে **কৈবর্ত বিদ্রোহ** শুরু হলে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পণ্ডিত **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী** ও **ডঃ এস. পি. লাহিড়ী** প্রমুখের মতে, কৈবর্ত হল কৃষিজীবি ও যুদ্ধপ্রিয় সম্প্রদায়। ঐতিহাসিক **গ্রিয়ারসন 'বেঙ্গল গেজেটিয়ারে'** বলেছেন, বাংলার চাষী ও মাহিষ্যরা কৈবর্ত। **ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের** মতে কৈবর্তরা সবাই মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের। দ্বিতীয় মহীপাল এই বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে নিহত হন। ফলে কৈবর্তরা উত্তরবঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলে।

কৈবর্ত বিদ্রোহ

● **রামপাল (১০৮৪-১১৩০ খ্রীঃ) :** দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর তার ভাই রামপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। তাঁর সভাকবি **সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত"** (শ্লেষকাব্য) রামপালেরই জীবনকাহিনী মাত্র। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়, কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করতে সুকৌশলে তিনি বহু সামন্তরাজাকে নিজ পক্ষে আনেন। এইসব রাজাদের নামের একটি তালিকা রামচরিতে আছে—(১) দন্তভুক্তি বা দাঁতনের রাজা **জয়সিংহ,** (২) বিষ্ণুপুর বা কোটাটবির রাজা **বীরগুণ,** (৩) অপারমন্দা বা হুগলীর **রাজা লক্ষ্মীশূর,** (৪) কজঙ্গল বা রাজমহলের রাজা **নরসিংহ,** (৫) কৌশাম্বী বা রাজশাহীর **দ্বোরপবর্ধন** প্রমুখ তেরটি রাজ্যের রাজা। এঁরা প্রত্যেকেই রামপালকে সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া মাতুল রাষ্ট্রকূটরাজ **তিলক মথন** বা **মহানদেব** বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধারে রামপালকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। কামরূপ ও পূর্ববঙ্গের বর্মনরাজারা তাঁর কাছে পরাস্ত হন। গাহড়বাল ও চালুক্যবংশীয় রাজারাও তাঁর পরাজয় মেনে নেন। রামপাল বন্দী কৈবর্ত বিদ্রোহীদের প্রকাশ্যে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে গণহত্যা চালিয়েছিলেন। কলিঙ্গের রাজা **অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গকে** রামপাল পরাস্ত করতে পারেননি। তবে অনন্তবর্মাকে চাপে রাখতে তিনি সুদূর দক্ষিণের **চোলরাজ কুলোতুঙ্গের** সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। রামপালের নবনির্মিত রাজধানীর নাম ছিল **রামাবতী।** রামপাল ছিলেন বাংলার শেষ শক্তিশালী পালরাজা। দীর্ঘ ৫৩ বছর রাজত্বের পর ৮০ বছর বয়সে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে তিনি প্রাণ বিসর্জন দেন বলে রামচরিতে উল্লেখ আছে। রামপালের মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গেই পাল সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের চিরসমাপ্তি ঘটে।

কৃতিত্ব

• চোল শাসনব্যবস্থা (Chola Administration) :

প্রাচীন ভারতে চোলরা একটি সুষ্ঠু, সুদক্ষ ও সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। বিভিন্ন চোল রাজাদের শিলালিপি—বিশেষ করে প্রথম পরান্তকের লিপি, রাজরাজের তাম্রশাসন, সমসাময়িক মুদ্রা এবং বিভিন্ন চৈনিক ও আরব গ্রন্থকারদের রচনা থেকে চোল শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

উপাদান

চোল শাসনব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। (১) দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন রাজবংশের শাসনব্যবস্থায় সামন্তদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট, কিন্তু চোল শাসকরা সামন্তদের প্রভাব খর্ব করে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হন। (২) চোল শাসনব্যবস্থায় রাজা অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী হলেও, এখানে প্রাদেশিক শাসনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। (৩) এই শাসনব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠা। এই ব্যবস্থায় রাজা বা রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রজার সরাসরি যোগাযোগ ছিল—মাঝে কোনও মধ্যস্বত্বভোগী ছিল না।

বৈশিষ্ট্য

চোল শাসনব্যবস্থায় রাজা ছিলেন সর্বেসর্বা। রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক—ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রম হলেও সাধারণত জ্যেষ্ঠপুত্রই সিংহাসনে বসতেন। রাজারা একাধিক জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদে বাস করতেন এবং আড়ম্বরপূর্ণ উপাধি গ্রহণ করতেন। এই উপাধিগুলি ছিল *'চোল মার্তণ্ড', 'পাণ্ড্যকুলাশনি', 'গঙ্গইকোণ্ড', 'কড়ারগোণ্ড', 'চক্রবর্তীগণ'* প্রভৃতি। চোল রাজারা রাজার দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী

রাজা

---

১ "The administration of the Chola kingdom was highly systematized and evidently had been organised in very ancient times."—*The Oxford History of India*, Smith, P. 225.

ছিলেন। অনেক সময় মৃত রাজার স্মরণে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তাতে রাজার মূর্তি স্থাপন করে পূজা করা হত।

রাজা সর্বশক্তির আধার হলেও কখনোই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। (১) রাজদরবারে পুরোহিত, রাজগুরু ও ধর্মোপদেষ্টা উপস্থিত থাকতেন। (২) একটি সুসংগঠিত আমলাতন্ত্রের

আমলাতন্ত্র

মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালিত হত। আমলারা রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। কর্মচারী নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু জানা না গেলেও, তাঁরা যে যোগ্যতা, জন্ম, বংশকৌলিন্য ও সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে নিযুক্ত হতেন সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। (৩) শাসন পরিচালনায় রাজাকে সাহায্য করার জন্য কোনও মন্ত্রিপরিষদ ছিল কিনা তা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়, তবে তাঁকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য অবশ্যই একটি *কর্মচারী পরিষদ* ছিল। এই পরিষদের সদস্যরা রাজা কর্তৃক মনোনীত হতেন এবং তাঁদের উপদেশ গ্রহণ করা বা না করা সম্পূর্ণ রাজার স্বেচ্ছাধীন ছিল। (৪) রাজকর্মচারীরা বেতন হিসেবে জমি পেতেন। তবে এক্ষেত্রে জমির মালিকানা নয়—তাঁদের কেবলমাত্র রাজস্ব আদায়ের স্বত্ব প্রদান করা হত। কর্মদক্ষতার পুরস্কার হিসেবে তাঁদের 'উপাধি' দেওয়া হত। (৫) কর্মচারীদের কাজ পরিদর্শনের জন্য রাজা মাঝে মাঝে ভ্রমণে বের হতেন।

সমগ্র চোল রাজ্যকে বলা হত *'চোলমণ্ডলম'*। চোলরাজ্য *দুটি* ভাগে বিভক্ত ছিল—(ক) সামন্তশাসিত অঞ্চল, যেখানে সামন্তরাজারা কর দিতেন ও যুদ্ধকালে রাজাকে সৈন্য

প্রাদেশিক শাসন

দিয়ে সাহায্য করতেন এবং (খ) চোল রাজার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল। (১) রাজার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলিকে বলা হত *'মণ্ডলম'*। প্রদেশগুলির কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেত। (২) প্রদেশ বা মণ্ডলমগুলি কয়েকটি *'কোট্টম'* বা জেলায় বিভক্ত ছিল। (৩) কোট্টামগুলি *'নাড়ু'* বা অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। (৪) নাড়ুর অধীনে ছিল *'কুররম'* বা কিছু সংখ্যক গ্রামের সমষ্টি বা গ্রাম-সমবায়। সাধারণত রাজপুত্ররাই মণ্ডল-এর শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তাঁদের বলা হত 'মণ্ডলেশ্বর'।

ভূমিরাজস্ব ছিল সরকারি আয়ের প্রধান উৎস। এই কর নগদ অর্থে বা উৎপাদিত শস্যে দেওয়া যেত। করের হার সাধারণত উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-

রাজস্বব্যবস্থা

ষষ্ঠাংশের মধ্যে ওঠা-নামা করত। চোল সাম্রাজ্যে প্রায়ই জমি জরিপ করা হত এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি অনুসারে কর ধার্য করা হত। কৃষির উন্নতির জন্য সেচের উপর খুব গুরুত্ব আরোপিত হয়। যুদ্ধ, বন্যা প্রতিরোধ, বাঁধ ...র ও মন্দির নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত কর আদায় করা হত। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ...র আংশিক বা পুরোপুরিভাবে কর মকুব করা হত। ভূমিকর ছাড়াও লবণ, বনসম্পদ, বাণিজ্য, তাঁত, খনি, তেলকল, পশু, বাজার, খনি প্রভৃতি থেকেও কর আদায় করা হত। বৈদেশিক বাণিজ্যের দিকে রাজাদের যথেষ্ট নজর ছিল। জরিমানা থেকেও প্রচুর আয় হত। ... জমি, মন্দির, পুষ্করিণী, সেচখাল প্রভৃতি করমুক্ত ছিল।

বিচারের কাজ স্থানীয়ভাবেই পরিচালিত হত। গ্রামের বিচার চলত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। রাজকীয় আদালতকে বলা হত *'ধর্মাসন'*। পঞ্চায়েতের রায়ের বিরুদ্ধে

'নাডু'-র বিচারকের কাছে আপিল করা যেত। এই যুগে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার একই স্থানে হত। রাজা নিজে রাজদ্রোহের বিচার করতেন।

বিচারব্যবস্থা

শাস্তি হিসেবে জরিমানা, কারাদণ্ড, বেত্রদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড, হাতির পায়ের নীচে পিষে-মারা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল।

চোলদের একটি সুসংগঠিত সেনাবাহিনী ছিল এবং এর প্রধান ছিলেন রাজা। সেনাবাহিনী চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল—পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী, হস্তিবাহিনী এবং নৌবাহিনী। একটি চোল শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ৭০টি

সামরিক সংগঠন

'রেজিমেন্ট' নিয়ে চোলবাহিনী গঠিত ছিল এবং চোলদের সমগ্র সৈন্যসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার। তাদের হস্তিবাহিনীর সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। উপকূল রক্ষা এবং সামুদ্রিক কাজকর্মের ব্যাপারে চোলদের সুদক্ষ নৌবাহিনী যথেষ্ট সহায়ক ছিল। রাজা ও রাজপুত্ররা যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা পরিচালনা করতেন। রাজাদিত্য ও রাজাধিরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।

চোল রাজারা জনহিতকর কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। প্রজাদের সুবিধার্থে রাস্তাঘাট নির্মাণ, কৃষিকাজের জন্য জলসেচ, বাঁধ নির্মাণ, সেচখাল

জনহিতকর কার্যাবলী

খনন এবং চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও দেবমন্দির নির্মাণ প্রভৃতি কাজে প্রচুর অর্থব্যয় হত।

■ **স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন :** চোল শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা।[১] সে যুগে গ্রামগুলি যে ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করত এবং গ্রামশাসনে গ্রামবাসীদের যে ক্ষমতা ও অধিকার ছিল, তা সত্যই বিস্ময়কর। গ্রামশাসনে রাজকর্মচারীদের ভূমিকা ছিল নিছক পরামর্শদাতা বা দর্শকের—গ্রামের শাসনকার্যে তারা কোনও হস্তক্ষেপ করতেন না। গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ প্রশাসনে গ্রামবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করা। প্রত্যেক গ্রামে একটি করে নির্বাচিত সাধারণ সভা থাকত। এই সভার সদস্যরা গ্রামশাসন পরিচালনা করতেন। গ্রামগুলি বিভিন্ন পল্লি বা ওয়ার্ডে বিভক্ত থাকত এবং এইসব পল্লিগুলির জন্যও পৃথক পৃথক সভা (বা ওয়ার্ড কমিটি) ছিল। গ্রামের সকল মানুষ এইসব সাধারণ সভাগুলিতে যোগ দিতে পারত।

সাধারণ সভা ছিল দু'ধরনের—(১) *উর* এবং (২) *সভা* বা *মহাসভা*। গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই 'উর'-এর সদস্য ছিলেন। ব্রাহ্মণদের বসবাসকারী গ্রামের সমিতিকে বলা হত *'সভা'* বা *'মহাসভা'*। বিদ্যা, বয়স, যোগ্যতা, শুদ্ধ চরিত্র প্রভৃতি বিচার করে 'উর' বা 'সভা'-র কার্যনির্বাহী সমিতি গঠিত হত। এই সমিতির হাতে গ্রামীণ উন্নয়ন ও শাসনের সকল দায়িত্ব অর্পিত ছিল। গ্রামবাসীর মাথাপিছু খাজনা ধার্য, খাজনা আদায়, বাঁধ তৈরি, পুষ্করিণী ও খাল খনন, জমি জরিপ, পথঘাট, মন্দির, বিদ্যালয় নির্মাণ, অপরাধীর বিচার, জমি নিয়ে বিবাদ, কুটির শিল্পের বিকাশ প্রভৃতি সকল কাজই এদের করতে হত। এছাড়া

[১] "One of the remarkable features of the Chola administration was their encouragement to local self-government in the villages all over their empire."—Dr. Satish Chandra

...কাজের জন্য যেমন—পুকুর সংরক্ষণ, বিচার পরিচালনা (*'ন্যায়াত্তর'*), শান্তিরক্ষা, ...ঘাট নির্মাণ, মন্দির পরিচালনা প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক কমিটি ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার ...গ্রামসভাগুলির কাজকর্মের উপর কঠোর নজর রাখত, হিসাব পরীক্ষা করত এবং ...কাজকর্মে অবহেলার জন্য শাস্তিও দিত। **ডঃ *স্মিথ*** বলেন যে, চোল শাসনব্যবস্থা ...যথেষ্ট চিন্তাপ্রসূত ও দক্ষ।[১]

...চোল শাসনের গুরুত্ব (Importance of the Chola Rule) ঃ

...কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারত নয়—সমগ্র ভারত ইতিহাসে চোল শাসন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রাধান্যই নয়—উন্নত ধরনের শাসনব্যবস্থা এবং সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাসেও চোলযুগ ...সার দাবি রাখে। চোলযুগ দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে 'সুবর্ণ যুগ' হিসেবে চিহ্নিত। ...খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় দুশো বছর ধরে নানা বাধা-...বিপত্তির মধ্য দিয়ে চোলরা এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ স্থান এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চোলদের বিজয়-বাহিনী শ্রীলঙ্কার বেশ কিছু অঞ্চল এবং মালদ্বীপকে নিজেদের অধিকারে আনে। ...নের জন্য কলিঙ্গ ও তুঙ্গভদ্রার দোয়াব অঞ্চলেও চোল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ...শালী নৌবাহিনীর সাহায্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতেও তাঁদের প্রভাব বিস্তৃত ...দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে চোল শাসন নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।[২]

...কেবলমাত্র বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনই নয়—বিজিত অঞ্চলে তাঁরা একটি সুন্দর, সুষ্ঠু ও দক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে, যা নিজ বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। এ প্রসঙ্গে তাঁদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রশংসার দাবি রাখে। গ্রামীণ ...সাধারণকে শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে তাদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করা ...বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

...শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন চোল যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই নৌবাহিনীর সাহায্যেই তারা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, মালদ্বীপ, সিংহল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রায় ...আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। বঙ্গোপসাগর 'চোল হ্রদে' পরিণত হয়।

...সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান নেহাত কম নয়। এই যুগে

১১·১৩ চোল-সামুদ্রিক তৎপরতা (Chola Maritime Activities) : ভারতীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে চোলগণই সামুদ্রিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল। পানিকর-এর ভাষায় "The only Indian State which had a proper appriciation of sea power was the Chola Empire। চোল সম্রাটদের সামুদ্রিকনীতির ফলশ্রুতি হইল নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নৌ-ঘাঁটির প্রতিষ্ঠা ও মালয়ের উপকূল অঞ্চলে প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা।

চোল-রাজ প্রথম রাজরাজের সময় হইতেই চোলদের সামুদ্রিক তৎপরতা শুরু হয় বলা যায়। তিনিই সর্বপ্রথম চোল নৌ-শক্তি গড়িয়া তোলেন। সেই সময় কেরল, সিংহল ও পান্ড্য রাজগণ পশ্চিম-ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্মিলিত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেন। সেই সময় কেরল-রাজাদের সমর্থনে আরব বণিকগণও পশ্চিম-ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া যাইতেছিল। এই অবস্থায় পশ্চিম-ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যে কেরল, সিংহল ও পান্ড্যদের আধিপত্য ধ্বংস করিতে প্রথম রাজরাজ অগ্রসর হন। তাঁহার নৌ-শক্তির প্রথম সাফল্য হইল চের নৌ-শক্তির ধ্বংসসাধন এবং ইহার পর পান্ড্য-রাজ অমরভুজঙ্গ চোলদের হস্তে বন্দী হন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আরবদের বাণিজ্যিক তৎপরতা সম্বন্ধেও চোলগণ যথেষ্ট অবহিত ছিল। উহাদের প্রতিযোগিতা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে চোল নৌ-শক্তি মালাবার আক্রমণ করিয়া তাহা দখল করিয়া লয়। কিছুদিন পরে প্রথম রাজরাজ মালদ্বীপের উপর নৌ-আক্রমণ চালাইয়া তাহাও দখল করিয়া লন। সেই সময় মালদ্বীপ ছিল আরব বণিকদের এক অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র। সরাসরি আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করিতে ব্যর্থ হইলেও প্রথম রাজরাজ সিংহলের উপর নৌ-অভিযান চালাইয়া রাজধানী অনুরাধাপুর বিধ্বস্ত করেন এবং চোলগণ অনুরাধাপুর হইতে রাজধানী পোলোনারুভা-য় সরাইয়া লইয়া যায়।

যে নৌ-শক্তির পত্তন প্রথম রাজরাজ করিয়া যান, তাহার আরও সম্প্রসারণ ঘটে তাঁহার পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র চোলের আমলে। তিনি এক বিশাল নৌ-বাহিনী লইয়া বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া পেগু, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করেন। ইহার পর তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নৌ-অভিযানে বাহির হন। তাঁহার সর্বাধিক নৌ-কৃতিত্ব হইল ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে সুমাত্রার বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান। এই অভিযানে সুমাত্রার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বিজয়তুঙ্গবর্মণ চোলদের হস্তে বন্দী হন এবং সুমাত্রার এক অংশ চোল-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। 'বৃহত্তর ভারতে' ('Greater India') ইহার পূর্বে কোন ভারতীয় নৃপতির এই কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারেন নাই। প্রথম রাজেন্দ্র চোলের পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ-ভারত এবং ব্রহ্মদেশ ও মালয় উপদ্বীপের মধ্যে সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক তৎপরতা বেশ কিছুদিন অব্যাহত ছিল। প্রকৃতপক্ষে চোলদের নৌ-শক্তির প্রাধান্যের ফলে কিছুদিন বঙ্গোপসাগর 'চোল হ্রদে' (Chola Lake) পরিণত হয় এবং চোলদের ভয়ে সিংহল, সুমাত্রা ও 'বৃহত্তর ভারতের' অন্যান্য দেশ সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিত। চোলদের সামুদ্রিক প্রাধান্যের ফলে কিছু দিন বৃহত্তর ভারতীয় দেশগুলিতে ভারতীয় সামুদ্রিক তৎপরতা ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিরাপদ রহে*।

রাজপুতজাতির অভ্যুত্থান

(The Rise of the Rajputs)

১০.৪ রাজপুত যুগ ও ইহার গুরুত্ব (The Age of the Rajput and its importance) : হর্ষোত্তর যুগে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল রাজপুতজাতির অভ্যুত্থান। স্মিথের মতে অষ্টম শতাব্দীর পর হইতে রাজপুতগণ উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ

করিয়াছিলেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ কর্তৃক ভারত বিজিত হইবার সময় পর্যন্ত এই যুগকে ভারতের ইতিহাসে 'রাজপুত যুগ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই সময়ে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ রাজ্যই রাজপুতগণ কর্তৃক শাসিত ছিল। সেই যুগে মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্বদেশরক্ষার ব্যাপারে রাজপুতগণকেই অধিকতর দায়িত্ব বহন করিতে হইয়াছিল। বস্তুত রাজপুতগণের পরাজয়ের ফলেই উত্তর-ভারতে মুসলমান কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজপুতদের অবদান

রাজপুত নৃপতিদের রাজত্বকালের গুরুত্ব শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মুসলমান আক্রমণের যুগে তাঁহারাই ছিলেন হিন্দু ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির রক্ষক। ইওরোপীয় ঐতিহাসিকগণও রাজপুতজাতির বীরত্ব ও মহত্ত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।*

১০.৫ রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্পর্ক মতভেদ (Origin of the Rajputs): রাজপুতদের উৎপত্তি সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। রাজপুতানার কতক অঞ্চলে 'রাজপুত' কথাটির অর্থে ক্ষত্রিয় সামন্ত বা জায়গিরদারদের অবৈধ সন্তানগণকে বুঝায়। প্রচলিত 'রাজপুত' কথাটি সংস্কৃত কথা 'রাজপুত্র'-এর অপভ্রংশ। পুরাণে ও বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' 'রাজপুত' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

গোঁড়ামত: কাহিনী ও কিংবদন্তী অনুসারে রাজপুতগণকে সূর্য ও চন্দ্র বংশোদ্ভূত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা ('রাজপুতানার ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা) ও সি. ভি. বৈদ্য ('মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা) এই মতের সমর্থক। এই মতের সমর্থনে উক্ত গ্রন্থকারদ্বয় কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, যথা—

(১) কিংবদন্তী অনুসারে রাজপুতগণ সূর্য কিংবা চন্দ্র বংশোদ্ভূত ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই কিংবদন্তী রাজপুতানায় প্রাপ্ত অনুশাসনলিপি ও সাহিত্য দ্বারা সমর্থিত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মেবার-কিংবদন্তী অনুসারে মেবারের রাজগণ রামের বংশধর ছিলেন। কিন্তু গুহিলটদের অনুশাসনলিপি অনুসারে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জনৈক ব্রাহ্মণ।

(২) রাজপুতগণ বৈদিক-আর্যদের বংশধর না হইলে তাঁহারা সর্বস্ব পণ করিয়া হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা রক্ষার্থে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিতেন না। কিন্তু এই উক্তির উত্তরে ইহা বলা যায় যে, ধর্মান্তরিতগণ নূতন ধর্মের প্রতি অতিশয় অনুরাগী হয়। সুতরাং হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত রাজপুতগণ নিজেদের নূতন ধর্ম রক্ষা

* "Rajasthan exhibits the sole example in the history of mankind, of a people withstanding every outrage barbarity can inflict on human nature sustain and bent to the earth, yet rising buyant from the preasure and making calamity a whet-stone to courage"—Tod.

করার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সর্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধ করিবেন তাহা খুবই স্বাভাবিক। (৩) নৃতত্ত্বমূলক পরীক্ষার দ্বারা রাজপুতগণকে আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি সমন্বয়ে ভারতীয় জনসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার মধ্যে বহু জাতির বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং নৃতত্ত্বমূলক পরীক্ষার দ্বারা রাজপুতগণকে যথার্থ আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রমাণ করা সহজসাধ্য নহে। স্মিথ যথার্থই বলিয়াছেন, "I do not believe that anything worth knowing is to be learnt by measuring the skulls or noting physical characters of individuals in a population of such mixed origin"।

আধুনিক মত ঃ আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই পণ্ডিত ওঝা ও বৈদ্যের মত অগ্রাহ্য করেন। ইঁহাদের মতে রাজপুতগণ হূন, গুর্জর প্রভৃতি বহিরাগত জাতিগুলির সংমিশ্রণে উদ্ভূত। টড ও ক্রুক এই মতের সমর্থক। এই মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে, যথা—(১) হিন্দু জনসমাজের সহিত বহিরাগত জাতিগুলির সংমিশ্রণ, ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। শকদের সহিত হিন্দুদের বৈবাহিক সম্পর্কের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে হূন, গুর্জর প্রভৃতি বহিরাগত জাতিগুলি গ্রীক, কুষাণ ও শকদের ন্যায়ই ভারতের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া কালক্রমে ভারতীয় জনস্রোতে মিশিয়া যায়। ভারতীয় সমাজে বৃত্তি অনুসারে এই বহিরাগত জাতিগুলির স্থান নির্ধারিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রাজ্যস্থাপন করিয়া শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন,—তাঁহারা ক্ষত্রিয় বা রাজপুত নামে পরিচিত লাভ করেন। টডের মতে রাজপুতদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি শাখা হূন নামে পরিচিত ছিল। অনেক সময় বৃত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে বর্ণেরও পরিবর্তন ঘটে। যেমন মেবারের গুহিলটগণ মূলত ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু রাজ্যশাসনক্ষমতা লাভ করিলে তাঁহারা রাজপুত নামে পরিচিত হন।

(২) অনুশাসনলিপির সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে ইহা সমর্থিত হইয়াছে যে রাজপুতগণ বহিরাগত জাতি।

(৩) আকৃতিগত সাদৃশ্য হইতেও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে জাঠ ও গুর্জরদের ন্যায় রাজপুত নামে পরিচিত জাতি বহিরাগত এবং একই জাতিগোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত।

এই স্থানে স্মরণ রাখা দরকার যে রাজপুতদের সব কয়টি শাখাই বহিরাগত জাতি-গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত নহে। অন্তত ইহাদের কয়েকটি শাখা ভারতীয় জাতিগোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল—যেমন চন্দেলগণ, গহড়বালগণ।*

---

* **স্মিথের মত ঃ** স্মিথের মতে রাজপুতগণ ছিলেন একটি মিশ্রিত জাতি। ইহাদের কতকগুলি শাখা শক, হূন, কুষাণ প্রভৃতি বহিরাগত জাতিগুলি হইতে উদ্ভূত এবং কতকগুলি প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত। প্রথম দিকে এই দুইটি দল পরস্পর-বিরোধী ছিল। কিন্তু কালক্রমে এই দুই দলের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে।

প্রসারিত হয়। ... ভারতের দিকেও তাঁর

সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ ঃ সুলতান মামুদ ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৭ পর্যন্ত ২৭ বছর ধরে একনাগাড়ে ভারতের উপর আক্রমণ চালিয়ে যান। এই কালপর্বে তিনি কতবার আক্রমণ হানেন এবং তাঁর আক্রমণের উদ্দেশ্য কী ছিল এ নিয়ে পণ্ডিতরা একমত নন। (১) *স্যার হেনরি ইলিয়ট* (Sir Henry Elliot)-এর মতে তিনি মোট সতেরো বার আক্রমণ করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই বক্তব্য মেনে নিয়েছেন। (২) মোট ... বার ভারতের বুকে আক্রমণ হানলেও, ভারতে কিন্তু তিনি কোনও স্থায়ী সাম্রাজ্য ... উদ্যোগী হন নি এবং ভারতের অভ্যন্তরে তিনি কেবলমাত্র পাঞ্জাব ও মুলতান ... করেন—অন্য কোনও অঞ্চল নয়। পাঞ্জাব ছিল ভারতের প্রবেশদ্বার। তাই এই অঞ্চল জয় করে তিনি ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশের দরজা নিজ আয়ত্তে রাখতে চেয়েছিলেন। বলা হয় যে, এ সময় ভারতে কোনও স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। এজন্য অবশ্য কয়েকটি ... উল্লেখ করা যায়। (১) চন্দেল্ল, চালুক্য ও রাজপুতদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা ... পক্ষে সম্ভব ছিল না বা সমগ্র ভারতভূমির উপর আধিপত্য বিস্তারের উপযুক্ত বাহিনীও তাঁর ছিল না। (২) তিনি স্পষ্টই উপলব্ধি করেছিলেন যে, গজনি থেকে ভারতবর্ষের মতো একটি বিশাল দেশের শাসন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। (৩) মধ্য ... তাঁর সাম্রাজ্য ছিল এমনিতেই বিশাল। এই বিশাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতকে ... করে তিনি নিজ সমস্যা বৃদ্ধিতে রাজি ছিলেন না। (৪) ভারতের জল-হাওয়ার সঙ্গে ... তখন মানিয়ে নিতে পারে নি এবং তাদের মধ্যে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের ... মানসিকতাও তখন গড়ে ওঠে নি।

... বার ভারত আক্রমণ

... সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ... কারণ

ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য ঃ সুলতান মামুদ সতেরো বার ভারত আক্রমণ করেন। ... আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। (১) *ডঃ স্মিথ* (Dr. V. A. Smith)-এর মতে, "সুলতান মামুদ ছিলেন একজন ক্ষমতাশালী লুণ্ঠনকারী দস্যু।"[১] ভারতে তিনি নির্বিচারে লুণ্ঠন ও ... কাণ্ড চালিয়ে গেছেন। ধনরত্ন লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই তিনি এদেশে এসেছিলেন—এখানে কোনও স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নি। (২) তাঁর দরবারের ঐতিহাসিক *উতবি* (Utbi) *তারিখ-ই-ইয়ামিনি'* গ্রন্থে মন্তব্য করেন যে, "ভারত অভিযানের দ্বারা মামুদ নিজ বিশ্বাস ... ধর্মের প্রতি মহৎ কর্তব্য পালন করেন।" বলা হয় যে, সুলতান মামুদ খলিফার দেওয়া ... উপাধির সম্মান-রক্ষার্থে খলিফার কাছে শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে, তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে

নিয়মিত ধর্মযুদ্ধ চালাবেন। ***উতবি***-র এইসব উক্তির উপর নির্ভর করে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা বলেন যে, ধর্মীয় উন্মাদনার জন্যই তিনি ভারত অভিযানে আসেন এবং ও জন্যই তিনি হিন্দু মঠ-মন্দিরগুলি লুণ্ঠন করতেন। ***ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ*** (Dr. Ishwari Prasad) বলেন যে, তাঁর ভারত আক্রমণের যুগ্ম-প্রেরণা ছিল লুণ্ঠন ও ধর্ম। তিনি লিখছেন যে, "রাজ্য নয়—সম্পদ, বিজয় নয়—পৌত্তলিকতার ধ্বংসসাধন করাই ছিল তাঁর ভারত আক্রমণের লক্ষ্য।"[১] বলা বাহুল্য, এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি হিন্দু মঠ-মন্দিরগুলি লুণ্ঠন করতেন, কারণ এই যুগে মন্দিরগুলি প্রভূত ধনরত্নে পূর্ণ ছিল। হিন্দু মন্দিরগুলি লুণ্ঠন করলেও তিনি হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার কোনও চেষ্টা করেন নি—এমনকী তাঁর অধিকৃত সিন্ধু ও পাঞ্জাবে হিন্দুদের ধর্মেও তিনি হস্তক্ষেপ করেন নি। মধ্য এশিয়া থেকে 'গাজি' বা অবৈতনিক স্বেচ্ছাসৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁর ভারত অভিযানকে তিনি মাঝেমধ্যে 'ধর্মযুদ্ধ' বলে আখ্যায়িত করতেন। ***ডঃ মহম্মদ হাবিব*** (Dr. Md. Habib) বলেন যে, তাঁর ভারত আক্রমণের পশ্চাতে কোনও ধর্মীয় প্রেরণা ছিল না, ছিল লুণ্ঠনের উন্মাদনা।[২] তিনি মামুদ কর্তৃক হিন্দু মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের তীব্র নিন্দা করে এই কাজকে ইসলাম-বিরোধী বলে অভিহিত করেছেন। ***অধ্যাপক জাফর*** (Prof. S. M. Jaffar) বলেন, তিনি যদি কোনও হিন্দু মন্দির ভেঙে থাকেন তবে তা ধন-রত্নের লোভে। ***অধ্যাপক হ্যাভেল*** (Prof. Havell) বলেন যে, তিনি যেভাবে কনৌজ বা মথুরা লুণ্ঠন করেছিলেন, প্রয়োজন হলে অনুরূপভাবেই তিনি বাগদাদ বা যে কোনও মুসলিম নগর লুণ্ঠন করতেন। ***ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার***-এর মতে, মামুদ ছিলেন একজন বিশুদ্ধ আক্রমণকারী মাত্র। ধর্মপ্রচার বা সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে তিনি ভারতে আসেন নি। তাঁর অভিযানগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ধনসম্পদ লুণ্ঠন এবং ভারতীয় শাসকশ্রেণির নৈতিক ধ্বংসসাধন। (৩) বলা হয় যে, তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মধ্য এশিয়ায় সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং ইরানি সংস্কৃতির নব যুগের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। এজন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থ ও সম্পদ। এই কারণেই তিনি ভারত অভিযানে অগ্রসর হন। ***ডঃ রোমিলা থাপার***-এর মতে, মামুদের ভারত আক্রমণের লক্ষ্য ছিল এ দেশের অফুরন্ত ঐশ্বর্য। আফগানিস্তানের রাজনীতির সঙ্গে মধ্য এশিয়ার সম্পর্ক ছিল অধিকতর ঘনিষ্ঠ। এছাড়া চিন ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলগুলির লাভজনক বাণিজ্য থেকেও মামুদের প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি হত। সুতরাং ভারতের চেয়ে মধ্য এশিয়ায় রাজত্ব করাই মামুদের অধিকতর কাম্য ছিল। (৪) বারংবার ভারত আক্রমণ ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ভঙ্গ করার ফলে ইসলাম জগতে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তিনি *'বাৎ-সিকান'* বা *'মূর্তিভঙ্গকারী'*-রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। সুতরাং কেবলমাত্র সম্পদ সংগ্রহই নয়—ইসলাম জগতে নিজ মর্যাদা বৃদ্ধির প্রশ্নটিও তাঁর ভারত আক্রমণের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল।

ধর্মীয় উদ্দেশ্য

মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার

সোনা ও সম্মান

১. "Wealth and not territory, the extirpation of Idolatry and not conquest, were the objects of his raids."

২. "Mahmud wa... ...ed

■ **সুলতান মামুদের সাফল্যের কারণ ঃ** সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের সাফ জন্য বেশ কিছু কারণের উল্লেখ করা যায়। (১) এ সময় ভারতে কোনও কেন্দ্রীয় ছিল না। ভারতীয় রাজন্যবর্গ পারস্পারিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। তাঁদের পক্ষে কোনও প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। (২) সুলতান মামুদ ছিলেন একজন দক্ষ সেনা তাঁর নেতৃত্ব, দক্ষতা ও রাজ্যজয়ের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা তাঁকে অপরাজেয় করে (৩) তাঁর সেনাদল ছিল দরিদ্র এবং ধর্মান্ধ। ভারতের অফুরন্ত সম্পদের আকর্ষ অমুসলমানদের বিরুদ্ধে 'ধর্মযুদ্ধে' যোগদান তাদের নানাভাবে অনুপ্রাণিত (৪) ভারতীয় রাজন্যবর্গ বা সেনাদল কোনওভাবেই জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম বা উদ্দীপনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নি। অনেকে সুলতান মামুদকে সাহায্য করেন এবং গোপন তথ্য শত্রুর কাছে পৌঁছে দেন। (৫) মামুদের শক্তির অন্যতম উৎস ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন অশ্বারোহী বাহিনী। অপরপক্ষে ভারতীয় বাহিনী নির্ভর শ্লথগতিসম্পন্ন হস্তিবাহিনীর উপর।

■ **ভারত আক্রমণের ফলাফল ঃ** ভারতে স্থায়ীভাবে কোনও সাম্রাজ্য স্থাপন সুলতান মামুদের উদ্দেশ্য ছিল না এবং তা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। (১) কেবল আফগানিস্তানের শাহিরাজ্য, পাঞ্জাব ও মুলতান তিনি স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেছি

রাজ্য ও পাঞ্জাবের পতনের ফলে ভারতীয় প্রতিরক্ষার মেরুদণ্ডটিই ভেঙে পড়ে। র মুহুর্মুহু আক্রমণে হিন্দুকুশ পর্বতের প্রাকৃতিক নিরাপত্তা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তের তোরণদ্বার' খাইবার গিরিপথের উপর মামুদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে তে মুসলিম প্রভুত্ব স্থাপনের পথ সুগম হয়। তাঁকে নিঃসন্দেহে মহম্মদ ঘুরির পথপ্রদর্শক যায়। (২) তাঁর বারংবার আক্রমণের ফলে ভারতের বিভিন্ন মঠ, মন্দির ও নগরগুলি অপরিমিত সম্পদ লুণ্ঠিত হয় এবং সবই দেশের বাইরে চলে যায়—যা আর কখনও আসে নি। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দেশের অর্থনীতি ভেঙে (৩) যুদ্ধে ভারতীয় যোদ্ধাদের অধিকাংশ বিনষ্ট হয়, রাজপুত শক্তিগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং এর ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক কিছু ওলট-পালট হয়ে যায়। এইভাবে নৈতিক ও সামরিক শক্তিক্ষয়ের ফলে পরবর্তীকালে হিন্দুদের পক্ষে তুর্কি আক্রমণ রোধ করার শক্তি হ্রাস পায় এবং মহম্মদ ঘুরির আগমন সহজতর হয়ে ওঠে। (৪) আক্রমণের ফলে বহু সুন্দর সুন্দর মঠ, মন্দির, শহর, দুর্গ, দেবমূর্তি এবং রুচিসম্মত কীর্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (৫) তাঁর মণের ফলে ভারতে অনেক মুসলিম বণিক ও ব্যবসায়ীর আগমন হয় এবং তাদের মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়, ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথকে প্রশস্ত করতে সাহায্য করে। (৬) তুর্কি মণের সূত্রেই এদেশে সুফি সাধকদের আগমন ঘটে—যাঁরা হিন্দু-মুসলিম উভয়ের মধ্যে ভক্তি ও মৈত্রীর আদর্শ প্রচার করে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের পথ তৈরি করেন। (৭) মামুদের আক্রমণ থেকে ভারতবাসী কোনও শিক্ষা নেয় নি। সীমান্তকে সুদৃঢ় করার উদ্যোগ তারা গ্রহণ করে নি। মামুদের মৃত্যুতে তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়েছিল— ভাবতেও পারে নি যে, আগামীদিনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে আবার বিদেশি মণকারী আসতে পারে। দ্বাদশ শতকের শেষদিকে এই পথেই মহম্মদ ঘুরি ভারত মণ করলে ভারতীয় রাজন্যবর্গ দিশেহারা হয়ে পড়েন।

ধর্মান্ধ বা
রী নন

■ **সুলতান মামুদের কৃতিত্ব ঃ** ভারত ইতিহাসে সুলতান মামুদ একজন ধর্মান্ধ, নির্মম কারী এবং লুণ্ঠনকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। ভারতবর্ষে তিনি একের পর এক শহর, জনপদ ও মন্দির লুণ্ঠন করেছেন। তাঁর সমকালীন মুসলিমরা তাঁকে *'গাজি'* (ধর্মযোদ্ধা) এবং *'বাৎ-সিকান'* (মূর্তিভঙ্গকারী) বলে অভিহিত করতেন। এ সত্ত্বেও বলতে হয় যে, তিনি নানা গুণের কারী ছিলেন এবং তাঁকে নেহাৎ ধর্মান্ধ বা লুণ্ঠনকারী বলা যুক্তিযুক্ত নয়। হিন্দুদের তিনি ড়িত করেন নি বা তাদের উপর *'জিজিয়া'* আরোপ করেন নি। গজনিতে হিন্দুদের বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল এবং তারা স্বাধীনভাবে ধর্মানুষ্ঠান করতে পারত। ধর্মান্ধতা সম্পদের লোভেই তিনি হিন্দু দেবমন্দিরগুলি আক্রমণ করেন।